ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা

ভারতীয় সভ্যতার পরিণতির ধারা অনুসরণ করে, ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রধান তিনটি বিভাগ হ'ল প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস এই পুস্তকের বিষয়ীভূত।

ভারতীয় আর্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। বিভিন্ন ঐতিহাসিক খৃষ্টপূর্ব চারপাঁচহাজার থেকে আরম্ভ করে একহাজার বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন সময় এর জন্য নির্দেশ করেছেন। এই বিভিন্ন মতের সমন্বয় করে খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজার থেকে দেড়হাজার বৎসর আগে কোনো সময়ে এই ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছিল বলে ধরে' নেওয়া যায়। এই হিসাবে প্রাচীনযুগের আরম্ভকালকে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দুইহাজার বৎসরে স্থাপিত করা যেতে পারে।

এই সময়ে আর্য আক্রমণের ঢেউয়ের পরে ঢেউ ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তের ওপর আছড়ে পড়ছিল। যারা এইভাবে এসে ক্রমান্বয়ে দেশ অধিকার করছিল তাদের কোনো প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থা ও রীতিনীতি ছিল না, শ্রেণীবিভাগ কিছুকিছু থাকলেও জাতিভেদপ্রথা বিবর্তিত হয় নি। এই দেশচ্যুত যাযাবরের দল প্রকৃতির উপাসক ছিল, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবরূপে গ্রহণ করে' তাদের স্তুতিগানই এই সভ্যতার প্রথম সাংস্কৃতিক প্রয়াস, আর্যজাতির প্রথম সাহিত্য বেদ।

বেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন ঋগ্বেদ। এই গ্রন্থের অনেক অংশ

আর্যগণের ভারতে পদার্পণের পূর্বে রচিত হয়েছিল। ১০১৭ সূক্তসম্বলিত, দশ 'মণ্ডলে' বিভক্ত ঋগ্বেদের রচনা ও সংকলন শেষ হয় সম্ভবত খৃষ্টের একহাজার বৎসর আগে। বাকি তিন বেদ পরে ক্রমান্বয়ে সংকলিত হয়।

সামবেদে সোমযজ্ঞের মন্ত্রগুলি সংকলিত হয়। এই বেদ পূর্বার্চিকা ও উত্তরার্চিকা এই দুই অংশে বিভক্ত। এর সূক্তগুলি গাইবার জন্য ৫৮৩টি গান দেওয়া আছে। যজুর্বেদে যজ্ঞকার্যের মন্ত্রসমূহ সংকলিত হয় আর অথর্ববেদ রোগ, শত্রু, দৈত্য পশ্বাদি দমনের নিমিত্ত নানা অভিচারমন্ত্রের সমষ্টি। বেদের মধ্যে অথর্বই সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন এবং বহুদিন পর্যন্ত বেদরূপে পরিগণিত না হয়ে আঙ্গীরসরূপে পরিচিত ছিল।

বেদকে কেন্দ্র ক'রে আর্যদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়। শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান ছিল পুরোহিতের শিক্ষা। পুরোহিতের কাজ তিন প্রকার ছিল,—হোম, সামগান ও যজ্ঞের অন্যান্য ক্রিয়া। প্রথম প্রথম এক পুরোহিতের দ্বারা তিন কাজ সম্পাদিত হ'ত; ক্রমশ যজ্ঞকার্যের জটিলতাবৃদ্ধির সংগে তিন পৃথক পুরোহিতের প্রয়োজন হ'ত। এদের নাম ছিল হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতা। এদের মধ্যে হোতা প্রধান ও অপর দুইজন তার অধীন ছিল। হোতার কাজ ঋগ্বেদে, অধ্বর্যুর কাজ যজুর্বেদে ও উদ্গাতার কাজ সামবেদে নিবদ্ধ ছিল।

ক্রমশ পুরোহিতের শিক্ষার প্রয়োজনে আর্যদের প্রধান শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত হ'ল। প্রধান পুরোহিত হোতার কাজ ছিল মন্ত্র উচ্চারণের সংগে হোম, সে ঋগ্বেদে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতো, উদ্গাতা ছিল সোমযজ্ঞকারক ও সামবেদের গায়ক, তার গান ও সূক্ত তার বিশেষ শিক্ষণীয় ছিল, যজ্ঞের কার্যিক দিকের অধিকারী অধ্বর্যু যজুর্বেদদ্বারা

চালিত হ'ত। পৌরোহিত্যশিক্ষার এই পরিণতি সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব একহাজার থেকে আটশত বৎসরের মধ্যে হয়েছিল। তখন আর্যসভ্যতা শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্থাপিত ছিল।

ক্রমশ মুখে মুখে প্রচলিত হ'তে হ'তে বৈদিক পাঠের বিভিন্নতা ঘটলো ও তদনুসারে বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হ'ল। একেক শাখার অনুসারী দলকে সেই শাখার চরণ বলা হ'ত। অন্যদিকে বেদপাঠের জটিলতাবৃদ্ধির সংগে পদপাঠ, ঘনপাঠ, জটপাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন পাঠপদ্ধতির উদ্ভব হ'ল। পৌরোহিত্যের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিও বেদের শাখা ও পাঠপদ্ধতির বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন দলীয় কেন্দ্রে পরিণত হ'ল। ব্রাহ্মণগণ কোন স্বীকৃত কেন্দ্রে শিক্ষালাভ না করে' পৌরোহিত্য করতে পারতো না। পরে সমাজের বৃদ্ধির ধারায় পৌরোহিত্যের অধিকার সকীর্ণতর হয়ে তিনটি (কৌশীতকী সূত্র) বা দশটি (লাটায়ণ সূত্র) প্রাচীন মুনিবংশের বংশধরদের মধ্যে আবদ্ধ হ'ল।

বৈদিক শিক্ষার দুটি অংশ ছিল, বিধি ও অর্থবাদ। বেদমন্ত্রের অবলম্বনে যাগজ্ঞক্রিয়ার নির্দেশসমূহকে বিধি বলা হ'ত এবং অর্থের ব্যাখ্যাকে বলা হ'ত অর্থবাদ। ক্রমশ বিধি ও অর্থবাদ শাস্ত্রীয় রূপ পেল ব্রাহ্মণ গ্রন্থে। এই গ্রন্থে বিধি ও অর্থবাদ ব্যতিরেকেও পৌরাণিক ও জাতিগত কাহিনী ও ব্যাকরণ, ব্যুৎপত্তিত্ব, জ্যোতিষ ও নীতির ভিত্তি স্বরূপ বহু আলোচনা নিবদ্ধ হয়েছে। এইভাবে সংহিতা বা সূক্তের সংগে ব্রাহ্মণও বেদের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গৃহীত হ'ল। সম্ভবত খৃষ্টের জন্মের আটশত থেকে পাঁচশত বৎসর পূর্বে এই পরিণতি ঘটে।

খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে আর্যসভ্যতা আরো পূর্বে বিস্তৃত হয়ে গংগাযমুনার অববাহিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলে জনপদসভ্যতার উদ্ভব হল। অনেকে এই কালকে রামায়ণমহাভারতোক্ত কাহিনীর ঘটনাকাল বলে'

মনে করেন এবং এই সময় থেকেই ভক্তিধর্মের সূত্রানুসন্ধান করেন, যার উদ্গাতা শ্রীকৃষ্ণ এবং ধারক ভগবদ্গীতা।

এই সময়ে একদিকে যেমন ধীরে ধীরে ঐশ্বর্যময় জনপদগুলি গড়ে উঠছিল, অপরদিকে অনেক ব্রাহ্মণ ঋষি বেদসংহিতার দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য অরণ্যে তপোবন রচনা করে বসবাস করতেন। এঁদের বাণপ্রস্থ বা আরণ্যক বলা হ'ত। বেদান্ত বা আরণ্যকে এঁদের দার্শনিক চিন্তাধারা নিবদ্ধ হয়েছিল। যাজ্ঞিকদের যেমন ব্রাহ্মণ বাণ-প্রস্থদের তেমনি আরণ্যক ধর্মগ্রন্থ ছিল। এর মধ্যে সংহিতার রূপক-ব্যাখ্যা, অধ্যাত্মবাদ, কর্ম ও পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতির দার্শনিক ভিত্তি দেখতে পাওয়া যায়। এই বিবর্তন ব্রাহ্মণের সমকালে, অর্থাৎ সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব আটশত থেকে পাঁচশতের মধ্যে হয়েছিল।

দার্শনিক চিন্তাধারার আরো অধিক বিবর্তন হ'ল উপনিষদে। এর মধ্যে আঠারোটি প্রধান হলেও আজ পর্যন্ত শতাধিক উপনিষদগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। উপনিষদ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল 'কাছে-বসা'। আরণ্যক পণ্ডিতসমাজের সংঘবদ্ধ আলোচনা ও গবেষণার ফল এতে নিবদ্ধ হয়েছে। এগুলির অন্তর্গত বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে নাস্তিক্যও স্থান পেয়েছে।

ক্রমশ আরণ্যক মুনিদের তপোবনগুলি বৈদিক শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র-রূপে পরিণত হ'ল। পর্ণকুটিরাশ্রিত আশ্রমগুলির কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া না গেলেও সাহিত্যেতিহাসের সাক্ষ্যে তারা অমর হয়ে আছে। চিত্রকূটের তমসাতীরে বাল্মীকির তপোবন, গংগাযমুনার সংগমস্থলে ভরদ্বাজের আশ্রম, গংগা ও সরযূর সংগমে অগস্ত্যের, মিথিলার নিকট গৌতমের, বারাণসীতে বা হিমালয়ের 'দেবদারুবনে' ব্যাসের এবং আরো অনেক তপোবনের কাহিনী কাব্যে বর্ণিত হয়ে চিরস্থায়িত্ব লাভ করেছে।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তিকালে নৈমিষারণ্যের তপোভূমি অনেকটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিণতি লাভ করেছিল। সেখানে চতুর্বেদ, ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র, সংহিতা ও গান, শিক্ষা, ছন্দ, শব্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত প্রভৃতি পড়ানো হ'ত। প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক বিশেষজ্ঞ গুরু ছিলেন। আত্মজিজ্ঞাসা, ধর্ম, লোকায়ত, বৈশেষিক প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিতগণ দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। তাছাড়া নৈয়ায়িক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি ছিলেন। এই তপোবনগুলির মধ্যেই বেদীর নির্মাণ থেকে ক্ষেত্রতত্ত্ব, দ্রব্যগুণবিচারের থেকে জড়বিজ্ঞান, পশুদেহের পর্যবেক্ষণের থেকে জীববিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল।

আরো অনেক উপায়ে বৈদিক শিক্ষার প্রসার হ'ত। যজ্ঞসভার আলোচনা ও উপদেশ জ্ঞানপ্রচারের একটি প্রধান উপায় ছিল। ভাগবত ও পুরাণসমূহের রচনা ও প্রচার এইভাবেই হয়। জনপদবাসিগণের ধর্মোপদেশের প্রয়োজনে নগরে নগরে তিন থেকে দশজন পর্যন্ত পণ্ডিত নিয়ে 'পরিষদ' গঠিত হ'ত। এই পরিষদের চতুর্দিকে বিদ্যার্থিসমাগমে এগুলিও ক্রমে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হ'ত। তাছাড়া বড় বড় রাজসভায় ও তীর্থে রাজসম্মানপ্রার্থী ও পুণ্যকামী পণ্ডিতদলের সংগে সংগে শিষ্য সমাবেশে শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্ভব হ'ত। দেশে বিদ্যার এমন সমাদর ছিল যে যে-স্থলে যে-কারণেই পণ্ডিত সমাগম হ'ত সাধারণত সেই সব স্থানেই শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্ভব হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদের পরে সূত্রসাহিত্যের আবির্ভাব হয়। এর কাল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ছয়শত থেকে দুইশত বৎসরের মধ্যে। বেদাদি যেমন 'শ্রুতি', তেমনি এ-গুলি স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্গত। সূত্র প্রধানত তিনশ্রেণীর, যথা শ্রৌত—বৈদিক যাগযজ্ঞের জন্য প্রযোজ্য, ধর্ম—সামাজিক আচারব্যবহার প্রভৃতির জন্য ও গৃহ্য—

পিতাপুত্র, স্বামিস্ত্রী প্রভৃতির দায়িত্ব, অধিকার ও আচারব্যবহারের নিয়ম, এর মধ্যে ভারতীয় শিক্ষার বিধানও নিবদ্ধ হত। তাছাড়া চতুর্থ, শুল্ব-সূত্রে বেদিনির্মাণের নিদর্শন ও ব্যবস্থা ছিল যা-থেকে পরে ক্ষেত্রতত্ত্বের উদ্ভব হয়।

ধর্মসূত্র থেকে ধর্মশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে একমাত্র গৌতমের ধর্মশাস্ত্রেরই অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় (সম্ভাব্য কাল-খৃঃ পূঃ ৫০০)। তাছাড়া বাশিষ্ঠ, আপস্তম্ব ও বৌধায়ন ধর্মসূত্রও আছে। অধুনালুপ্ত মানবধর্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত মনুসংহিতার আনু-মাণিক কাল খৃষ্টপূর্ব দুইশত থেকে খৃষ্টীয় দুইশত বৎসরের মধ্যে।

ধর্মশাস্ত্র থেকে ব্যবহার বা আইনের উদ্ভব হয়। তার মধ্যে বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা ও নীলকণ্ঠের ময়ূখ আজ পর্যন্ত ভারতে প্রচলিত আছে। এ ছাড়া আরো এক শাস্ত্র—অর্থশাস্ত্রের উদ্ভব হ'ল। এই পরিণতি সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব পাঁচশত বৎসরের মধ্যে হয়। চাণক্যের অর্থশাস্ত্র এর মধ্যে প্রধান।

জ্ঞানবিজ্ঞানের বৈচিত্র্যবৃদ্ধির সংগে সংগে বিভিন্ন প্রকার চরণদলের (schools of learning) উদ্ভব হ'ল। বেদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক, অধিযাজ্ঞিক, স্বাভাবিক প্রভৃতি, ব্রাহ্মণগণের বিভিন্ন দল অনুযায়ী ঋগ্বেদী, যজুর্বেদী, মাধ্যন্দিন, মৈত্রায়নি, আপস্তম্ব, হিরণ্যকেশী প্রভৃতি এবং দেশভেদে উদীচী, প্রতীচী প্রভৃতি চরণ দেখা দিল এবং প্রত্যেক চরণের জন্য তাদের প্রয়োজনানুযায়ী বিশেষ শ্রৌতসূত্র রচিত হ'ল। তাছাড়া বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনার জন্যও বিভিন্ন চরণের সৃষ্টি হয়েছিল।

অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে বেদিগঠনের নিয়ম থেকে বীজগণিত ও ক্ষেত্রতত্ত্ব, যজ্ঞকালনির্ণয়ের হিসাবের থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতি-

বিজ্ঞান ও বলিদত্ত পশুদেহের পর্যবেক্ষণ থেকে শারীরবিদ্যার উদ্ভব হয় এবং শব্দ ও ভাষাবিজ্ঞানকে অবলম্বন করে' শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, কল্প ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাংগের উদ্ভব হয়। পূর্বমিমাংসা ও উত্তর-মিমাংসা, সাংখ্য ও যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক এই ষড়দর্শনে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের আরো পরিণতি হয়।

আর্যসংস্কৃতির ইতিহাসে ব্যাকরণের আলোচনা অতি প্রাচীনকালে পরিণতি লাভ করেছিল। পাণিনি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে তাঁর অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেছিলেন; তিনি তাঁর পূর্বের আরো চৌষট্টিজন বৈয়াকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বার্ত্তিক ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলির মহাভাষ্য রচিত হয়। এগুলি পাণিনির ব্যাকরণেরই টীকা, অর্থাৎ ব্যাকরণের অভিমতে পাণিনির কথাই শেষ কথা।

খৃষ্টপূর্ব ছয়শত থেকে দুইশত বৎসরের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যে লিপির নিয়োগকাল বলে' বলা হয়ে থাকে। আর্যদের ভারতে আগমনের আগেই এদেশে লিপির প্রচলন ছিল। সম্ভবত অনার্যসংস্পর্শের জন্য আর্যদের ধর্মবিষয়ে লিপির ব্যবহারে দেরি হয়েছিল এবং বহুদিন পর্যন্ত বেদাদি মৌখিকভাবেই প্রচারিত হত।

যেমন দর্শনবিজ্ঞানের দিকে তেমনি সামাজিক ব্যবস্থার দিকেও, এই কয়েক শতাব্দীতে আর্য সভ্যতার বহু বিবর্তন ঘটে। আর্যরা ঐতিহ্যহীন, বর্বর, যাযাবর সভ্যতা নিয়ে ভারতে এসেছিল, এ-দেশে বসবাসের সংগে সামাজিক আচারনীতির বিবর্তন ও কর্মবিভাগ অনুসারে জাতিভেদের উৎপত্তি হ'ল। প্রথমে 'গুণকর্মবিভাগশ' অধিকারিভেদে জাতির নির্ণয় হ'ত, কিন্তু ক্রমশ তা জন্মগত অধিকারে পরিণত হয়। একদিকে অনার্য-সংস্পর্শ এড়ানোর প্রচেষ্টা, অন্যদিকে শিল্পী ও ব্যবসায়িগণের সংঘচেতনা, এই দুয়ে মিলে সম্ভবত জন্মগত জাতিভেদ প্রথার মূল দৃঢ় করেছিল।

আর্যরা যখন ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করতে থাকে তখন অনার্যদের মধ্যে দ্রাবিড়সভ্যতা বহিরংগের দিকে আর্যসভ্যতার থেকে অনেক উন্নত ছিল। আর্যগণ অনার্যদের কাছে শুধু তাদের লিপিই গ্রহণ করেনি তাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতায়ও অনেকখানি অনার্যপ্রভাব পড়েছিল। নাগরিক সভ্যতার ও শিল্পকলার দ্রুত পরিণতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়শিক্ষার জটিল ব্যবস্থার উদ্ভব দ্রাবিড়দের পরিণত নাগরিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে সম্ভব হয়েছিল।

এ-যুগের যুগান্তকারী পরিণতি হ'ল বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও ধর্ম-প্রচারে (মৃত্যু—খৃঃ পূঃ ৪৮৩, ৪৮৬ বা ৫৪৪)। এই ঘটনা যুগান্ত-নির্দেশক, কারণ এরপর ভারতীয় সভ্যতার রূপের এত পরিবর্তন ঘটতে থাকে যে প্রাচীন যুগের আদ্যাংশ এখানে শেষ হয়েছে বলে' ধরা হয়ে থাকে এবং খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতককে যুগসন্ধিকালরূপে গণ্য করা হয়।

এই সময়ে বেদবিরোধী বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচার ও বৈশ্যসমাজের শক্তিবৃদ্ধির ফলে গণচেতনার সূচনা হয়। প্রাকৃতের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে 'বৈদিক' 'দেবভাষা'র ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। শ্রেষ্ঠি সমাজের উন্নতির সংগে এই সময়ে শিক্ষা ও শিল্পের বহু উন্নতি হয়।

তক্ষশীলা ও উজ্জয়িনী এ-সময়ের প্রধান দুই শিক্ষাকেন্দ্র। প্রাচীন গান্ধারের রাজধানী তক্ষশীলা খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকেই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং ক্রমান্বয়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, গ্রীক ও পারসিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারার সংগমস্থল হয়েছিল। এখানে চৌষট্টিকলার শিক্ষা ও চিকিৎসাবিদ্যার গভীর আলোচনা হত।

বৌদ্ধপ্রভাবে, বিশেষত অশোকের সময়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়। মহাভারতে মানব ও পশুর চিকিৎসার বর্ণনা এবং আয়ুর্বেদ,

ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র এই চারি উপবেদের কথা পাওয়া যায়। এগুলি বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের শিক্ষার পরিণতির প্রতি নির্দেশ করে। ব্রাহ্মণ সমাজের শেষ পরিণতির শিখরে আবির্ভূত বৌদ্ধধর্মের আওতায় এই পরিণতিগুলি আরো বিকাশ লাভ করে।

রামায়ণ মহাভারতের রচনাকালকে (ঘটনাকাল আরো পূর্বের) বৌদ্ধধর্মের পূর্বকালীন বলে' অনুমান করা হয়ে থাকে। এইজন্য যুগ-সন্ধিকালীন সামাজিক চিত্রের পক্ষে এই গ্রন্থদ্বয় মহামূল্য। মহাকাব্য বর্ণিত সমাজচিত্রে ব্রাহ্মণ্য আচারনীতির পরিণতির সংগে আদিম বর্বরতার অবশিষ্টের মিশ্রণ দেখা যায়, যথা নরবলি, গোমাংসভক্ষণ, স্ত্রীলোকের বহুস্বামিত্ব ইত্যাদি। নূতন পরিণতির মধ্যে দেখি যে বৈদিক ধর্মের স্থলে দেবদেবীর পূজার প্রচলন সুরু হয়েছে। পুনর্জন্ম ও অবতারবাদের প্রচার হয়েছে, বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব চারশত থেকে দুইশতের মধ্যে এই সব অবস্থার বিবর্তন ঘটেছিল বলে' অনুমান করা হয়।

ঐতিহাসিক রাজগণের মধ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টপূর্ব তিনশত কুড়ি-পঁচিশের লোক ছিলেন। মৌর্যযুগে রাজ্যশাসন সুব্যবস্থিত হয়েছিল, স্থায়ী রাষ্ট্রীয় সেনাদল ছিল, রাজপ্রাসাদে সশস্ত্র রক্ষিণীরা পাহারা দিত, ধনুর্ধারিণীরা ভোরে এসে হাজিরা দিত, বারবনিতারা রাজসভায় বিশেষ সম্মানিতা ছিল ও রাজনৈতিক কাজে নিযুক্ত হ'ত। তাম্বুলকরংক বাহিনী, চামরধারিণী প্রভৃতি পরিচারিকারা রাজার সেবা করতো। রাষ্ট্রীয় চিকিৎসাবিভাগ ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে সঞ্চরণশীল সেবাবাহিনী ছিল, নারীরা আহত ও আর্তের পথ্যাদির প্রস্তুতীকরণে নিযুক্ত হ'ত। শিল্প-কলা ও পূর্তব্যবস্থার পৃথক রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল, পথঘাটের সুব্যবস্থা ছিল, পাটলিপুত্র থেকে তক্ষশীলা পর্যন্ত বিস্তৃত এক প্রশস্ত রাজপথ ছিল।

চাণক্য বা কৌটিল্য ছিলেন এ যুগের যুগনির্মাতা, তাঁর অর্থশাস্ত্র শাসন-বিজ্ঞানের অক্ষয়কীর্তি।

অশোকের রাজত্বকালে (খৃষ্ট পূর্ব ২৭৩-২২২) সিংহল পর্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচার হয়েছিল। শিল্পসংস্কৃতির উন্নতির সংগে জনহিতকর কার্যাবলি ও পরধর্মসহিষ্ণুতা এ-যুগের বিশেষ লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম রাজকুলে গৃহীত হবার ফলে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। আদি, নিরীশ্বর হীনযান বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি বুদ্ধপূজা সমন্বিত মহাযান বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় আড়ম্বরের সংগে পালিত হত।

যুগসন্ধিকালের পর খৃষ্টপূর্ব ১৮৫ সাল থেকে খৃষ্টীয় ৬৪৭ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ শুংগদের অভ্যুত্থান থেকে হর্ষের সাম্রাজ্যের পতনের সময় পর্যন্ত, আদিযুগের অন্ত্যাংশ গণনা করা হয়। শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অভূত-পূর্ব পরিণতি এই যুগকে গৌরবমণ্ডিত করেছিল। এরও মধ্যে আবার গুপ্তযুগ (খৃঃ ৩২০—৫৮০) স্বর্ণযুগ বলে খ্যাত। শিল্পের ও স্থাপত্যের বহুল উন্নতি হয়েছিল মঠ, মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণে। কণিষ্কের সময়ে তক্ষশীলার গ্রীকপ্রভাবিত গান্ধারশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়।

আর্যভট্ট (জন্ম ৫৭৫ খৃঃ) ও বরাহমিহির (মৃত্যু ৫০৭।৮৭ খৃঃ) জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের ঐতিহাসিক যুগ এ সময়ে আরম্ভ হয়। কণিষ্করাজের চিকিৎসক চরক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক ছিলেন এবং সুশ্রুতের কাল ছিল খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতক। ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের খ্যাতি আরবের মধ্য দিয়ে য়ুরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। রাজগণ বার্ত ও পূর্তবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং

ভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে প্রাচীনতম প্রাপ্ত সংস্কৃত অভিধান অমরকোষ খৃষ্টীয় পাঁচশতের রচনা।

এই যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে প্রাকৃতের বহুল প্রচার ঘটেছিল। জাতকের ভাষা 'পালি' এক প্রকারের প্রাকৃত, অশোক তাঁর শিলালিপিগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতের ব্যবহার করেছিলেন। অপরপক্ষে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে সংস্কৃত রাজসভা-সাহিত্যের অভ্যুত্থান হয়। প্রথম প্রাপ্ত সংস্কৃত নাটক 'মৃচ্ছকটিক' খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রচনা, কিন্তু মহাকবি কালিদাস, মুদ্রারাক্ষসরচয়িতা বসুবন্ধু প্রভৃতি পঞ্চম শতকের লোক ছিলেন। প্রাচীনতম প্রাপ্ত পুরাণ 'বায়ুপুরাণ' খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে রচিত হয়েছিল। 'হর্ষচরিত' রচয়িতা বাণ এই যুগের শেষাংশের লোক ছিলেন।

বৌদ্ধমঠগুলি এই যুগের নূতন শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। প্রধানত ভিক্ষুদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হ'লেও মঠের আশ্রয়ে অন্য লোকেরও উচ্চশিক্ষার উপায় ছিল এবং অনুমান করা যায় যে ভিক্ষুকগণ সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার করেছিলেন। বিহারের নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ও গৌরবের এই কাল এবং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের প্রধান কেন্দ্র ছিল বলভি। নবরত্নের গৌরবে উজ্জ্বল উজ্জয়িনী ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম পাশাপাশি শান্তিতে বিরাজ করতো। রাজা অশোকের সময় থেকে বৌদ্ধধর্ম ভারতের অনেকাংশের রাজধর্মে পরিণত হলেও ব্রাহ্মণ্য ও জৈনধর্মের কোনোদিন বিলুপ্তি ঘটেনি। কণিষ্ক ও গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কেবল এ-দেশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলনা। অশোকের সময়েই এই ধর্ম সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। খৃষ্টীয় ৩৫৭

থেকে ৫৭১ এর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের আন্তর্জাতিকতার ভাব বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়। ৩৮৩ খৃষ্টাব্দে কুমারজীবের দ্বারা চীনদেশের সংগে দৌত্যযোগ স্থাপিত হয় এবং দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সংগেও যোগাযোগ হয়েছিল। কাশ্মীরের যুবরাজ গুণবরম যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেছিলেন এবং ৪৩১ খৃষ্টাব্দে নান্‌কিনে তাঁর মৃত্যু হয়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীন, তিব্বত, কোরিয়া, মধ্য এসিয়া, বোখারা প্রভৃতি দেশ থেকে বৌদ্ধভিক্ষুগণ আসতেন এবং বিক্রমশীলার সংগে চীন ও তিব্বতের সংঘগুলির বিশেষ সংযোগ ছিল। এই যোগাযোগ পরবর্তী যুগেও বর্তমান ছিল, যথা, অতীশ ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গিয়েছিলেন।

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের পতনের সংগে (খৃঃ ৬৪৭) এই যুগের অবসান হয়। এরপর থেকে খৃষ্টীয় ১৭৬৪ পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের মধ্যযুগ। মধ্যযুগও আদ্য ও অন্ত্য এই দুই অংশে বিভাজ্য। খৃষ্টীয় ৬৪৭ এর পর থেকে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মধ্যযুগের আদ্যাংশ গণনা করা হয়। ভারতের ঐক্যহানি এই যুগের বিশেষ লক্ষণ, কারণ হর্ষের মৃত্যুর পর এদেশে আর কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি রইলোনা। খৃষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বীর রাজপুতজাতির অভ্যুত্থান হয়েছিল কিন্তু তারাও ভারতে কেন্দ্রীভূত কোনো শক্তির প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

পৌরাণিক হিন্দুধর্মের উত্থান এর পূর্বযুগেই হয়েছিল, এ-যুগে বেদ-পাঠ ক্রমশ অপ্রচলিত হয়ে যায় এবং যাঁরা পাণ্ডিত্য অর্জন করতেন তাঁরা প্রধানত বেদাংগ, ষড়দর্শন স্মৃতি ও পুরাণাদির আলোচনা করতেন।

মালতীমাধবরচয়িতা ভবভূতি ছিলেন এ সময়কার শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। রাজভোজের সভাকবি কর্পূরমঞ্জরীরচয়িতা রাজশেখর নবম শতাব্দীর লোক ছিলেন। জয়দেব এ-যুগের শেষের দিকের কবি।
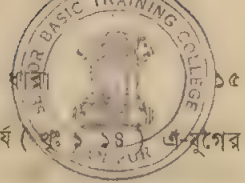
বীজগণিত ও ক্ষেত্রতত্ত্বের পণ্ডিত ভাস্করাচার্য (খৃঃ ১১১৪) এ-যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট ও নবম শতাব্দীতে শংকরাচার্য, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের নেতা ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর লোক অতীশ বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে প্রধানতম ছিলেন। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজ তাঁর ভক্তিধর্মের প্রবর্তন করেন।

হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সংগে বহুদিনকার ধর্মীয় শান্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং এই অশান্তি মুসলমান আক্রমণের সময় পর্যন্ত বিরাজ করেছিল। তারপর বৌদ্ধধর্ম একরকম ভারতের বুক থেকে লুপ্ত হয়ে গেল।

শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে নালন্দা ও বিক্রমশীলা এ-যুগেও বিদ্যমান ছিল ও কণিষ্কমহাবিহার নবম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুধর্মের কেন্দ্রের মধ্যে কান্যকুব্জ ও বারাণসী সর্বপ্রধান ছিল আর শংকরাচার্য ধর্ম-প্রচারকের দল প্রস্তুত করার জন্য যে সব মঠের প্রতিষ্ঠা করেন তার মধ্যে দ্বারকা শৃংগেরি, বদরি ও পুরীর মঠই প্রসিদ্ধ।

এই যুগে মধ্যযুগীয় বিশেষ শিক্ষাধারার প্রবর্তন হয়। চৈনিক পরিব্রাজক আই-সিং তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ছয় বৎসর বয়সে বালকের শিক্ষারম্ভ হ'ত ও ছয়মাস অধ্যয়নে বর্ণমালা শেষ হ'ত। তারপরের তিন বৎসর প্রাথমিক গণিত, ব্যাকরণ ইত্যাদি পড়ানো হ'ত এর আর তিন বৎসর কাব্য, সাহিত্য, কোষ ইত্যাদি। যারা অধিক পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চাইতো, তারা এরপর জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যোতিষ্কবিজ্ঞান, কর্ম, শব্দ, ব্যাকরণ প্রভৃতির মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে বিশেষ পাঠ নিত। অধীত বিষয়ের মধ্যে ব্যাকরণের প্রাধান্য ছিল এবং কাশিকাবৃত্তি, পাতঞ্জলশাস্ত্র প্রভৃতি অবলম্বনে পাণিনির ব্যাকরণ পড়ানো হ'ত। কাব্যের মধ্যে নাটকের আদর ছিল এবং ন্যায়,

মিমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন ও স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা হ'ত।

এই সময়ের নোতুন ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছিল দক্ষিণ-ভারতীয় মন্দির সংশ্লিষ্ট মহাবিদ্যালয়গুলির মধ্যে। বেদের আলোচনা সমগ্র ভারতে বারাণসীও এই বিদ্যাপীঠগুলির মধ্যেই কিছু বিদ্যমান ছিল।

খৃষ্টীয় ১২০০ থেকে ১৭৬৭ পর্যন্ত, অর্থাৎ ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের সূত্রপাত থেকে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বংগদেশে দেওয়ানির সনন্দলাভ পর্যন্ত, মধ্যযুগের অন্ত্যাংশরূপে গণনা করা হয়।

মীরাবাঈ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি এ-যুগের সাধক কবি ছিলেন। পৃথ্বীরাজের সভাকবি চাঁদবরদাই এ-যুগের প্রথমাংশে 'চাঁদরয়সা' রচনা করেছিলেন। বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা এ-যুগে রচিত ও প্রচারিত হয়। বহু অত্যাচার সত্ত্বেও মুসলমান রাজগণ অনেক ক্ষেত্রে লৌকিক ভাষাসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং বিশেষ করে' বাংলা-দেশে অনুবাদ সাহিত্যের সমৃদ্ধির পিছনে তাঁদের প্রভাব দেখা যায়।

এ-যুগের ভাস্কর্যের নিদর্শন এলোরা, কৈলাসমন্দির প্রভৃতিতে এবং মুসলমান স্থাপত্যের অপূর্ব ঐশ্বর্যে।

ধর্মক্ষেত্রে নবাগত রাজধর্ম ইসলামের আনুগত্য এদেশের অনেকে স্বীকার করেছিল, তাছাড়া নানক, কবীর, চৈতন্যদেব প্রভৃতি ধর্মোপ-দেষ্টার উদ্ভব হয়। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আর এইসব নূতন প্রচারিত আদর্শ পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল।

এই সময়কার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি মধ্যযুগের প্রথমাংশের সূত্রানুসরণ করে চলেছিল। মন্দিরসংলগ্ন সংস্কৃত বিদ্যালয়গুলি দক্ষিণভারতেই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এগুলিতে বেদ, ব্যাকরণ ও বিভিন্ন শাস্ত্র পড়ানো হ'ত। ছাত্রগণের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা সাধারণত রাজগণের দানে

হ'ত, অনেক ক্ষেত্রে জনপদের পরিষদও সাধারণ ভাণ্ডার থেকে দান করতো। নিষ্কর ভূমির আয় থেকে কোনো কোনো মহাবিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহিত হ'ত। ছাত্রদের ধান্য ও স্বর্ণদান করার ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক অধ্যাপক নিয়মিত বেতন ভোগ করতেন। কাশ্মীরের রাজগণ এই যুগে বিদ্যার্থীর সহায়তা করেছেন। রাজা জয়সিংহের (খৃঃ ১১২৮-১১৪৯) সময়ে তাঁর প্রধান মন্ত্রী কতকগুলি ছাত্রাবাসের নির্মাণ করিয়েছিলেন। শংকরাচার্যের প্রতিষ্ঠিত মঠগুলিও এইযুগে বিদ্যাপীঠরূপে বর্তমান ছিল।

এই সময়ের বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান টোল। এখানে সামান্য খড়ে ছাওয়া ঘরে গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেন। ছাত্রগণ কুটিরে বাস করতো এবং জীবনযাত্রা ছিল সরলতম। গুরুগণ নিজব্যয়ে শিষ্যদের শিক্ষা, অন্নবস্ত্র ও বাসের ব্যবস্থা করতেন। কোনো কোনো সময়ে ধনিগণও অর্থসাহায্য করতেন। বারাণসীতে পুণ্যার্থী ধনিগণের স্থাপিত অনেক সত্র ছিল। বারাণসী, মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি এই সময়ের টোলগুলির কেন্দ্র ছিল।

হিন্দুরাজ্যগুলির ধ্বংস ও মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ফলে এ যুগে রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অশান্তি বিরাজ করতো। মুসলমানের আমলে হিন্দুদের শিক্ষা যে শুধু রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয় তা নয় মঠমন্দিরাদির সম্পত্তিহরণ ও ধ্বংসাধন করে' মুসলমানেরা মসজিদ ও ইসলামীয় শিক্ষাকেন্দ্রের স্থাপন করে। ভারতের প্রায় সর্বত্রই এইসব কারণে হিন্দুদের শিক্ষাব্যবস্থার অধোগতি ঘটে। সামাজিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত টোল ও পাঠশালাগুলি সম্ভবত নিজেদের বাহ্যিক অকিঞ্চিৎকরতার জন্যই কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করে থাকতে পেরেছিল। কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে মুসলমানের প্রভাব পরে পৌঁছায় বলে সেখানকার ব্যবস্থা কিছুদিন অধিক আয়ু পেয়েছিল।

ব্রাহ্মণের শিক্ষা

আর্যসভ্যতার যে গৌরবময় যুগে 'গুণকর্মবিভাগশ' মানুষের জাতি-ভেদ নির্ণিত হত তখন জ্ঞান অর্জন ও বিদ্যাদান ব্রাহ্মণের জাতিগত কর্ম ছিল, ব্রাহ্মণের লক্ষণ ছিল জ্ঞান। ব্রাহ্মণেতর জাতি থেকে ব্রাহ্মণত্ব লাভের কথা বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রহ্মর্ষি এবং দেবর্ষি ও জনক জ্ঞানবলে রাজর্ষি হয়েছিলেন, ব্রাহ্মণসন্তানগণ পর্যন্ত অশ্বপতি, অজাতশত্রু ও প্রবাহণজাবালের মতো জ্ঞানী রাজাদের গুরুত্বে বরণ করতেন, দাসীপুত্র সত্যকাম জাবাল ঋগ্বেদের এক বিশেষ শাখার স্রষ্টা ছিলেন, মহামুনি বাল্মীকি শূদ্র ছিলেন। অপরপক্ষে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভের বিবরণ থেকে এও অনুমান করা যায় যে অব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বলাভ বহু কষ্ট ও সাধনাসাধ্য ছিল।

জ্ঞানার্জন ও বিদ্যাদান ব্রাহ্মণের জাতিগত ধর্ম হওয়ার জন্য এদের বিবিধ বিদ্যা অর্জন ও দান করতে দেখা যায়। পাণ্ডবদের দুই অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য ব্রাহ্মণ ছিলেন; দ্রুপদরাজার পুত্রগণ এক ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট বৃহস্পতিনীতি শিখতেন; রাজতরংগিণী-রচয়িতা, ব্রাহ্মণ, কল্হণের পিতৃব্য কাশ্মীররাজপুত্রগণকে সংগীতশিক্ষা দিতেন; জাতকে ব্রাহ্মণগণের নানা বিদ্যাদানের উল্লেখ পাওয়া যায়; তক্ষশীলায় ব্রাহ্মণরা সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা দিতেন; মনু বলেছেন যে ব্রাহ্মণগণ বেদাদি ভিন্ন সাহিত্য ও বার্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করবে এবং অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেবে।

এই সকল উদাহরণ ও বিধান থাকা সত্ত্বেও পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণের প্রধান কাজ ও বেদাধ্যয়ন তার প্রধান শিক্ষা বলে পরিগণিত হ'ত। প্রথম প্রথম উপনয়নের অধিকারী প্রথম তিনটি জাতিরই বেদাধিকার

ছিল ; পরে একদিকে জাতিভেদের কাঠিন্য ও অপরদিকে অন্যজাতির বিশেষ শিক্ষার জটিলতার বৃদ্ধি হওয়ায় ব্রহ্মবিদ্যা একমাত্র ব্রাহ্মণের অধিকারে পর্যবসিত হয়।

ব্রাহ্মণের এই শিক্ষার প্রাচীনতম কেন্দ্র ছিল তপোবন, বাণপ্রস্থ মুনিগণ সেখানে শিক্ষা দিতেন। পরে পরিষদের পরিণতিতে তীর্থস্থানে, রাজধানীতে ও অন্যান্য জনপদে গুরুকুলের প্রবর্তন হয়। বিভিন্ন শাখার মুনিগণ এই সব কেন্দ্রে শিক্ষা দিতেন।)

ব্রাহ্মণসন্তানের বিদ্যারম্ভের প্রথম অনুষ্ঠানরূপে 'বিদ্যারম্ভসংস্কার' বা 'অক্ষরস্বীকরণমে'র উল্লেখ খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর কোনোকোনো স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চৌল অনুষ্ঠানের ও 'রঘুবংশে' চৌলকর্মের' উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চম বর্ষে অথবা অন্ততপক্ষে উপনয়নের পূর্বে এই অনুষ্ঠান হ'ত।

(বৈদিক শিক্ষার প্রারম্ভিক সংস্কার ছিল উপনয়ন। ঋগ্বেদে এর উল্লেখ আছে কিন্তু বিবরণ নেই। অথর্ববেদে জটাকৌপীনধারী, মৃগচর্মপরিহিত ব্রহ্মচারীর বর্ণনা আছে। পরবর্তী বিবরণে জানা যায় যে উপবাস, মস্তকমুণ্ডন, কৌপীনমেখলাধারণ, হোম, ভিক্ষা, অস্মারোহণ প্রভৃতির দ্বারা উপনয়ন সম্পন্ন হ'ত। প্রথমে এই অনুষ্ঠান বেদপাঠের প্রারম্ভিকমাত্র ছিল, পরে তিন দ্বিজাতির পক্ষে অবশ্যকরণীয় সংস্কারে পরিণত হয়। শেষে এই সংস্কার বেদপাঠের সংগে সম্পর্কবিরহিত জাতিচিহ্নে পর্যবসিত হয়।

উপনয়নের পর বিদ্যার্থী সমিধ ও ভিক্ষা নিয়ে উদ্দিষ্ট গুরুর নিকট আবেদন করতো। এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা অথর্ববেদ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। কৃতজ্ঞ, বশ্য, বুদ্ধিমান, পবিত্র, মানসিক ও শারীরিক রোগমুক্ত, ঈর্ষ্যাহীন, সুস্বভাবসম্পন্ন, সুহৃদ্‌সেবক, ধন ও বিদ্যাদাতা

প্রভৃতি লক্ষণ দেখে গুরু শিষ্যকে গ্রহণ করতেন। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় বর্ণিত আছে যে যারা সদ্‌গুণ, চরিত্র, বংশ ও পারিপার্শ্বিকের বলে উপযোগী বলে' গণ্য হ'ত তারাই শিক্ষার যোগ্য বলে' বিবেচিত হ'ত। এইজন্য গুরু প্রথমে জন্ম ও বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করতেন। তারপর অনুষ্ঠান ও আশীর্বাদের দ্বারা শিষ্যত্বগ্রহণ হ'ত।

শিষ্যত্বলাভের পর বিদ্যার্থীকে গুরুগৃহে সন্তানরূপে বসবাস করতে হ'ত। তার চরিত্র, বুদ্ধি ইত্যাদির পরীক্ষার পর গুরু শিক্ষাদান করতেন; কিন্তু একবৎসরের অধিক কাল এরূপ পরীক্ষা করা নিষিদ্ধ ছিল। ছান্দগ্যোপনিষদে আছে যে গুরু যদি পাঠারম্ভে এক বৎসরের অধিক কাল বিলম্ব করেন তবে শিষ্যের সমুদয় পাপ তাঁতে বর্তায়।

শিষ্যত্ব দুই প্রকারের হ'ত—উপাকরণক বা গৌণ এবং নৈষ্ঠিক বা মুখ্য। উপাকরণকেরা প্রতি বৎসর উপাকরণ উৎসব থেকে উৎসর্জনের কাল পর্যন্ত শিক্ষা নিত ও নৈষ্ঠিকেরা সমুদয় শিক্ষাকাল ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বাস করতো। গৃহস্থদের বিদ্যালোচনার সুযোগ দেওয়ার জন্য সম্ভবত উপাকরণক শিষ্যত্বের প্রবর্তন হয়েছিল।

গুরুকুলবাসী শিষ্যকে অন্তেবাসিন বা আচার্যকুলবাসিন বলে' অভিহিত করা হ'ত। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত গুরুকে ত্যাগ করা ধর্মবিগর্হিত ছিল।

শিষ্যের জীবনধারা সরল ও কর্মবহুল ছিল। গুরুগৃহের সমুদয় কাজ শিষ্যকে করতে হ'ত। সমিধ ও জল আহরণ, যজ্ঞবেদী পরিষ্কার করা, গোচারণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ, শস্যক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি শিষ্যগণের কর্তব্য ছিল। তাদের ভিক্ষাচরণ করতে হ'ত। অভিশপ্ত ও জাতিচ্যুতদের নিকট ভিন্ন সকলের নিকট ভিক্ষা নেওয়া চলতো। নিজ আত্মীয়স্বজন এমন কি, অভাবপক্ষে গুরুর কাছের ভিক্ষা করা যেতো।

ভিক্ষালব্ধ অন্ন গুরুকে দিতে হ'ত, গুরু তার থেকে যা শিষ্যকে দান করতেন তাই সে নির্জনে, নিলোভমনে আহার করতো।

ব্রহ্মচারীকে সূর্যোদয়ের পূর্বে, ব্রাহ্মমুহূর্তে, গাত্রোত্থান করতে হ'ত, সায়ংসন্ধ্যায় আহ্নিক ও গায়ত্রীপূজা করতে হ'ত, নিয়মিত স্নান করতে হ'ত কিন্তু স্নানে বিলাসিতা বা জলকেলি তার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তাকে দিনে একবার মাত্র, দক্ষিণ বা পূর্বমুখে বসে, নীরবে, পরিমিত আহার করতে হ'ত। মাছমাংস, নুন, পান, সুপারি, বাসি খাদ্য প্রভৃতি তার নিষিদ্ধ ছিল। ভূমি বা নিম্নশয্যায় সে শয়ন করতো। ব্রহ্মচর্যপালন আবশ্যক ছিল।

গুরুশিষ্যের সম্পর্ক অতি নিগূঢ় ছিল।) গুরু অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণত্ব দান করতে পারতেন, অধ্যাত্মজীবনের পিতৃস্বরূপ ছিলেন। বৈদিক শিক্ষা মৌখিক ছিল বলে' আবৃত্তি ও উচ্চারণবিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তায় গুরুর প্রাধান্য অত্যন্ত অধিক হয়েছিল। গুরু জ্ঞান, ধর্ম ও মুক্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ গৃহীত হতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুর কিরূপ স্থান ছিল একলব্যের কাহিনী থেকে তা অনুমান করা যায়।

এতদ্ব্যতিরিক্ত(গুরুশিষ্যের মধ্যে পিতাপুত্রের সম্পর্ক স্থাপিত হ'ত।) সমিধ ও ভিক্ষাহস্তে গুরুবরণের গূঢ়ার্থ ছিল গুরুগৃহে হোমের অংশগ্রহণ করার ও তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বগ্রহণের প্রতিজ্ঞা। শিষ্যের সাংসারিক সমুদয় কাজ করার মধ্যেও পিতাপুত্রের সম্পর্কেরই ইংগিত পাওয়া যায়। (গুরুগৃহের সমুদয় কর্তব্যসাধন, গুরুর আজ্ঞাপালন গুরুসেবা প্রভৃতি কর্তব্যের মধ্যে শিষ্যের পাঠ অগ্রসর হ'ত।

গুরুর সম্মুখে দেয়ালে হেলান দেওয়া, পায়ের ওপর পা তুলে বসা, পা লম্বা করা প্রভৃতি অকর্তব্য ছিল। গুরুনিন্দা মহাপাপ বলে গণ্য হ'ত।

শিষ্যকে প্রভাতে গুরুর পূর্বে উঠতে ও রাত্রে তাঁর পরে শুতে হ'ত।
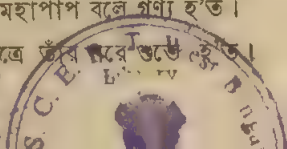
গুরু কথা বলার সময়ে শিষ্য বসে' বা শুয়ে থাকলে উঠে দাঁড়াতে হ'ত। গুরু দূর থেকে ডাক্‌লে নিকটবর্তী হয়ে উত্তর দিতে হ'ত।) গুরু যদি শিষ্য অপেক্ষা নীচাসনে বসতেন অথবা যদি গুরুর দিক থেকে শিষ্যের দিকে বা শিষ্যের দিক থেকে গুরুর দিকে হাওয়া বইতো, তবে শিষ্যকে স্থান পরিবর্তন করতে হ'ত।

জাতিচ্যুতি ঘটতে পারে এমন কোন কাজ ভিন্ন সববিষয়ে,(সবসময়ে গুরুর একান্ত বশ্যতা শিষ্যের ধর্ম ছিল। গুরুবাক্যের প্রতিবাদ তার অকর্তব্য ছিল।) গুরুর নাম শিষ্যের অনুচ্চার্য ছিল। (গুরু ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন শিষ্যের কর্তব্য ছিল।)

/গুরুর ও শিষ্যের প্রতি পালনীয় কর্তব্য ছিল। বিদ্যাদান ব্রাহ্মণের জাতিধর্ম হওয়ায় কোনো উপযুক্ত বিদ্যার্থীকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার গুরুর ছিলনা। ধনিদরিদ্রনির্বিশেষে শিষ্যগণের শিক্ষাকালীন সমুদয় ভার গুরুকে বহন করতে হ'ত। শিক্ষান্তে দক্ষিণা ভিন্ন কোনো বেতন তিনি নিতে পারতেননা।)

অবশ্য আর্যসভ্যতার জটিলতাবৃদ্ধির সংগে এই নিয়মের পরিবর্তন হয়। জনপদসভ্যতার অভ্যুদয়ের পরে শিষ্যগণকে যারা যথেষ্ট দক্ষিণা দিতে পারতো ও যারা(পারতো না এই দুই দলে বিভক্ত করা হয়। দ্বিতীয় দল শ্রমমূল্যে শিক্ষালাভ করতে পারতো।) মধ্যযুগে দক্ষিণভারতের সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের মতো প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের গুরুগণ বেতনভুক ছিলেন।

(শিষ্যকে নিজপুত্রের মতো মনে করা গুরুর কর্তব্য ছিল। তিনি শিষ্যকে ব্যক্তিগত পবিত্রতার আচার, সূর্যোপাসনা ও দৈনন্দিন ধর্মপালনের শিক্ষা দিতেন এবং নিজ আয়ত্ত সমুদয় জ্ঞানবিজ্ঞান পরিপূর্ণ মনোনিবেশে ও নিঃশেষে দান করতে বাধ্য ছিলেন।)

গুরুর ব্যবহারসম্বন্ধে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে স্পষ্ট জীবগণকে বেদনা না দিয়ে মংগলবিষয়ে উপদেশ দিতে হবে এবং পবিত্র নীতি মেনে চলতে উৎসুক গুরুকে মিষ্ট ও নম্র বাক্য ব্যবহার করতে হবে। যিনি কায়মনোবাক্যে পবিত্র ও সম্পূর্ণ সংযত কেবল তিনিই বেদান্তলব্ধ সমদয় ফলভাক্ হবেন। যন্ত্রণার মধ্যেও যেন তিনি অপরকে মর্মপীড়ক বাক্য না বলেন, যেন কথায় বা কাজে অপরের কোন অনিষ্ট না করেন, যেন অপরের ভীতিজনক কথা উচ্চারণ না করেন, কারণ তাহ'লে তাঁর স্বর্গ-প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হবে।

(শাসনের দিক দিয়ে প্রাচীন ব্যবস্থাপকগণ কঠিন শাস্তিদানের বিরোধী ছিলেন। গৌতমের মতে সাধারণত কোনো শিষ্যকে কায়িক শাস্তি দেওয়া উচিত নয় কিন্তু উপায়ান্তর না থাকলে গুরু সরু দড়ি বা বেত দিয়ে আঘাত করতে পারেন।) আপস্তম্ব ভীতিপ্রদর্শন, উপবাস, শীতলজলে স্নান, গুরুর সান্নিধ্য থেকে নির্বাসন প্রভৃতি শাস্তির বিধান দিয়েছেন। মনু বলেছেন অপরাধী শিষ্যকে চেরা বাঁশ বা দড়ি দিয়ে কেবলমাত্র দেহের পশ্চাদ্ভাগে আঘাত করা যায়। যে গুরু অন্য কোনো প্রকার কায়িক শাস্তি দেবেন তাঁকে চোরের সমান দোষী বলে গণ্য করা হবে।

শাসনব্যবস্থা কঠোর না হলেও ব্রহ্মচারীর আচার ব্যবহারের নিয়ম-কঠিন ছিল। কাম, ক্রোধ, লোভ, ধন্দ, বাচালতা, বাদ্যবাদন, স্নান (বিলাসপূর্ণ), মধু, মাংস, গন্ধদ্রব্য, মালা, দিবানিদ্রা, লেপনী, কজ্জল, যান, জুতা, ছাতা, দন্তমঞ্জন, নৃত্য, গীত, নিন্দা, ভয়, আনন্দোচ্ছ্বাস, দুষ্পাচ্য খাদ্য প্রভৃতি ব্রহ্মচারীর অবশ্য পরিত্যাজ্য ছিল। থুতুফেলা, হাস্য, হাইতোলা, আঙুল মটকানো প্রভৃতি নিষিদ্ধ ছিল। জিহ্বা, বাহু ও উদরকে সংযত রাখতে হ'ত, তীব্রবাক্য এড়িয়ে চলতে হ'ত, গুরুজনের

সংগে সর্বদা সশ্রদ্ধভাবে কথা বলতে হ'ত। নীচকর্ম, অদত্তগ্রহণ ও জীবের অনিষ্টসাধন ব্রহ্মচারীর নীতিবিগর্হিত ছিল। ব্রহ্মচর্যব্রত অবশ্য পালনীয় ছিল, স্ত্রীস্পর্শ ও স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। মাদকদ্রব্যসেবন ব্রাহ্মণ মাত্রেরই নিষিদ্ধ ছিল।

জাতিভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নের বয়স, ঋতু ও ধার্য দণ্ডপরিধেয়াদি বিভিন্ন ছিল। ব্রাহ্মণের উপনয়নের বয়স সর্বাপেক্ষা কম হ'ত, তদূর্ধে ক্ষত্রিয়ের ও তদূর্ধে বৈশ্যের।) ধীশক্তির কল্পিত তারতম্যানুযায়ী বয়সের এইরূপ নির্দেশ হয়েছিল।

বেদশিক্ষা সমাপ্ত করার জন্য অত্যন্ত দীর্ঘকালের প্রয়োজন হ'ত। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে যে ভরদ্বাজ মুনি তিনজন্ম বেদপাঠে অতিবাহিত করার পর ইন্দ্রকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিলেন যে চতুর্থ জন্ম লাভ করলে তিনি বেদপাঠে কাটাবেন, কারণ বেদ অনন্ত। ছান্দ-গ্যোপনিষদে দেখা যায় যে ইন্দ্র একশত বৎসরকাল প্রজাপতির শিষ্যত্ব করেছিলেন। অপরপক্ষে সাধারণক্ষেত্রে দেখি যে একেক বেদের জন্য বারোবৎসরের হিসাবে চতুর্বেদ অধ্যয়ন করতে হ'লে আটচল্লিশ বৎসর সময় লাগতো। মেগাস্থিনিস্ (খৃঃ পূঃ তিনশত) বলেছেন ভারতীয় ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্যকাল সাঁইত্রিশ বৎসরকাল স্থায়ী হ'ত। আরো সাধারণ হিসাবে মানুষকে শতায়ু ধরে' জীবনের প্রথম পাদ, অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মাচর্যাশ্রম গণনা করা হ'ত।

এই দীর্ঘ পাঠকালের সমস্ত সময় পড়া হ'তনা, পাঠের নির্দিষ্ট ঋতু ছিল। সূত্রসাহিত্য থেকে জানা যায় যে বৎসরের মধ্যে ৪½।৫½ মাসকাল বেদপাঠ হ'ত। ক্ষেত্রবিশেষে আষাঢ় বা ভাদ্রে অথবা সূর্যের দক্ষিণায়ণের পর পাঁচমাস বেদপাঠ হ'তে পারতো। সাধারণত শ্রাবণি পূর্ণিমার দিন থেকে বাৎসরিক পাঠারম্ভ হ'ত।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অনেক উৎসব ও অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হ'ত। এর মধ্যে প্রথম ছিল 'সংস্কার' জাতীয় যা-কিনা, একেক শিষ্যের ব্রহ্মচর্যকালে একবারমাত্র পালনীয় ছিল। ব্রহ্মচর্যের প্রারম্ভিক সংস্কার ছিল উপনয়ন এবং শেষ সংস্কার সমাবর্তন বা স্নান। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শেষে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশকালে এই সংস্কার অনুষ্ঠিত হ'ত। গুরুর অনুমতি ও সুধিমণ্ডলের অনুমোদনে বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে গৃহীত হ'লে, গুরুদক্ষিণা দিয়ে ক্ষৌরকর্ম ও বিলাসস্নানের পর গার্হস্থ্যাশ্রমের উপযোগী সুন্দর পরিচ্ছদ ধারণ করে পূর্ণকাম বিদ্যার্থী স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতো।)

বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মধ্যে উপাকর্মণ বা শ্রাবণি এবং উৎসর্জন প্রধান ছিল। এরমধ্যে প্রথমটি বাৎসরিক পাঠারম্ভের ও দ্বিতীয়টি পাঠশেষের উৎসব ছিল। এ-ছাড়া গোদানব্রত প্রভৃতি ব্রতাদিও পালিত হ'ত।

এ-গুলি বাদে বহু 'অনধ্যায়' বা ছুটির দিন থাকতো। উপাকর্মণ ও উৎসর্জনের সময়ে দুই বা তিনদিন করে ছুটি হ'ত। বিশেষ বিশেষ মাসের বিশেষ বিশেষ তিথিতে পাঠ নিষিদ্ধ ছিল। সূর্যচন্দ্রগ্রহণে, ঋতু-পরিবর্তনে, রাজা ও রাজপুত্রের জন্মমৃত্যুতে, রাজসেনাদলের জয়পরাজয়ে এক থেকে তিনদিন পর্যন্ত অনধ্যায় থাকতো। মুনি, ঋত্বিক, গুরু, বন্ধু ও শিষ্যের মৃত্যুতেও অনধ্যায় হ'ত। অশৌচকাল অনধ্যায় ছিল ও শ্রাদ্ধের দানভোজনের পর অহোরাত্র পাঠ হ'তনা। গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়ে কোনো পশু চলে গেলেও পাঠ বন্ধ থাকতো।

পাঠ্যক্রম সুদীর্ঘ ছিল বেদ ও বৈদিক সাহিত্য ভিন্ন ব্যাকরণ, ইতিহাস, পুরাণ ও বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞান ব্রহ্মচারীর শিক্ষণীয় ছিল। সবাই সব বিষয়ে শিক্ষালাভ করতো না, প্রত্যেকেই বিদ্যার বিশেষ শাখা নির্বাচন করে তাতে পাণ্ডিত্য লাভ করতো। এমনকি চতুর্বেদী পণ্ডিতের

সংখ্যাও বিরল ছিল। ধীশক্তির তারতম্যানুযায়ী ব্রহ্মচারী এক বা একাধিক বেদ অধ্যয়ন করতো।

শিক্ষাপদ্ধতি মৌখিক, মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল ও অনুষ্ঠানবহুল ছিল। গৌতমসূত্রে বর্ণিত একটি পাঠের বিবরণ থেকে এই আচার-বাহুল্যের খানিকটা অনুমান করা যায়ঃ—শিষ্য গুরুর বামহস্ত নিজ দক্ষিণহস্তে এমনভাবে ধারণ করবে যাতে তাঁর বৃদ্ধাংগুষ্ঠ মুক্ত থাকে ও তাঁকে উদ্দেশ করে বলবে 'মহাশয়, আবৃত্তি করুন!' সে তার দৃষ্টি ও মন গুরুর প্রতি নিবদ্ধ করে' মস্তকস্থিত ইন্দ্রিয়গুলিকে কুশাগ্রদ্বারা স্পর্শ করবে; তিনবার পনেরো মুহূর্তের জন্য শ্বাসরোধ করে' পূবমুখী কুশের আসনে বসবে; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, সত্যম্ ও পুরুষঃ এই পাঁচ ব্যাহৃতি সে উচ্চারণ করবে ও প্রতি ব্যাহৃতি 'ওঁ সত্যম' বলে' আরম্ভ করবে। তারপর গুরুকে প্রণাম করে' তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে, সাবিত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করবে।

অন্যান্য গ্রন্থেও এইরূপ জটিলতাপূর্ণ আনুষ্ঠানিকের বিবরণ পাওয়া যায়।

আর্যশিক্ষার লিপির ব্যবহার বহুদিন পর্যন্ত হয়নি বলে' মৌখিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন হয় এবং এই শিক্ষায় মুখস্থ বিদ্যার ওপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হ'ত। 'শব্দ ব্রহ্ম' বলে গৃহীত হওয়ায় উচ্চারণবিশুদ্ধির প্রাধান্য ছিল। এই সব কারণে পাঠদান অতি ধীরে অগ্রসর হত।

ঋগ্বেদের এক প্রাতিশাখ্যে এই কণ্ঠস্থ করার প্রণালীর একটি বিবরণ পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত হলে তিনটি ও দীর্ঘ হলে দু'টি শ্লোক নিয়ে একেকটি প্রশ্ন হ'ত। প্রত্যেক প্রশ্নকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে' গুরু উচ্চারণ করিয়ে দিতেন ও শেষে সমুদয় প্রশ্নটি শিষ্যগণ সমস্বরে আবৃত্তি করতো। সাধারণত ষাটটি প্রশ্নে একটি পাঠ বা অধ্যায় হত।

অপরপক্ষে শিক্ষার ওপর রহস্যবাদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। শ্বেত-কেতুকে তার পিতা শিক্ষার অর্থ বুঝিয়েছেন, যার দ্বারা অশ্রাব্যকে শোনা ও অজ্ঞেয়কে জানা যায়। বেদের শিক্ষা হ'ত অর্থবাদ ও বিধির সাহায্যে অর্থাৎ সূক্তগুলির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের নির্দেশে, কিন্তু এই বিধি ও অর্থবাদ ব্রাহ্মণগ্রন্থের মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে গেলে পর শিক্ষকের কাজ গতানুগতিক ও যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। এতদ্ভিন্ন সূত্রসাহিত্যের দ্বারা বৈদিক সাহিত্যের ব্যাখ্যা হ'ত, কিন্তু সূত্রগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে তার ব্যাখ্যার জন্য টীকার প্রয়োজন হ'ত। গুরুর কাজ ছিল কেবল বিশুদ্ধ উচ্চারণ-বিধির প্রয়োগে ও নির্দেশে।

বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় গুরুর কিছু অধিক স্বাধীনতা ছিল। পদ, বাক্য ও প্রমাণের দ্বারা এই শিক্ষা অগ্রসর হ'ত।

বাচস্পতিমিশ্রের বিবরণ থেকেও অনেকটা অনুরূপ পাঠপদ্ধতির কথা জানা যায়। এতে পাঠের চারি অংশ নির্দিষ্ট হয়েছে। প্রথম 'অধ্যয়ন,' বা শিক্ষণীয়বস্তুর শ্রবণ; দ্বিতীয় 'শব্দ' বা অর্থগ্রহণ; তৃতীয় 'উহ' বা যুক্তিদ্বারা বোধের উদ্ভব এবং চতুর্থ 'দান' বা আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের দ্বারা প্রয়োগ। এতে আরো বলা হয়েছে যে জ্ঞানলাভের একপাদ ($\frac{১}{৪}$) হয় গুরুর নিকট, একপাদ নিজ অধ্যয়নে, একপাদ সুহৃদ্বর্গের সমর্থনে ও এক-পাদ জীবনের অভিজ্ঞতায়।

তপোবনের শিক্ষাপদ্ধতির দুটি দিক ছিল, ব্যক্তিগত ও শ্রেণিগত। কখনও কখনও গুরু সমস্ত শিষ্যকে একত্র উপদেশ দিতেন আবার কোনো কোনো বিষয়ে প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করতেন। এই পদ্ধতিতে কার্যিক ও জ্ঞানিক শিক্ষার একত্র সমাবেশ হয়েছিল। একদিকে বেদাদির অধ্যয়ন, অপরদিকে আশ্রমিক সমুদয় কার্যসাধন, শিক্ষাকে সামঞ্জস্যহীন পাণ্ডিত্যের বোঝায় পরিণত হতে দেয়নি।

এই শিক্ষায় কোনো বাৎসরিক অথবা শেষ পরীক্ষা ছিলনা। গুরুর অনুমতি ও সুধিসমাজের অনুমোদনে শিক্ষাসমাপ্তি সূচিত হ'ত এবং পরজীবনে রাজসভা, তর্কসভা প্রভৃতিতে চিরকাল এর পরীক্ষা চলতো। গুরু প্রশ্নের দ্বারা শিষ্যের বিচার করতেন ও পণ্ডিতেরা পরস্পরকে তর্কে আহ্বান করে' নিজ পাণ্ডিত্যের প্রাধান্য প্রচার করতেন।) সমাপ্তপাঠ ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মবাদ্য, ব্রহ্মোদ্য, বিপ্র, কবি প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিদ্বারা সম্মানিত হতেন।

প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণের এই শিক্ষার ব্যবস্থা অতি সুগ্রথিত ছিল। শিষ্যগণ গুরুগৃহে বাস করে শিক্ষালাভ করতো তাই এই প্রথাকে আবাসিক বলা যায়, কিন্তু গুরুকুলগুলির আবহাওয়া গার্হস্থ্য ছিল, ছাত্রাবাসের মতো প্রাতিষ্ঠানিক ছিলনা। গুরুপরিবারের স্বাভাবিক পারিবারিক প্রেক্ষিতে শিষ্যগণ বাস করতো; বৃহত্তর তপোবনগুলিতেও এই আদর্শ বিদ্যমান ছিল।

সাধারণত একজন গুরুর অধীনে ১৫।২০ জনের অধিক শিষ্য থাকতো না: কিন্তু বিখ্যাত মুনিগণ পাঁচশত পর্যন্ত শিষ্য পেতেন বলে শোনা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে গুরু তাঁর পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র বা বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্যগণের সহায়তায় অধ্যাপনা করতেন। অবশ্য এতৎসত্ত্বেও প্রাচীন গুরুকুলে গুরুর একাধিপত্য ছিল এবং এই ব্যক্তিগত কেন্দ্রগুলি সাধারণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়নি।

গুরুকুল শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যক্তিগত হ'লেও রাজকুলের সহায়তা এর পিছনে সর্বদা বিরাজ করতো। ঋগ্বেদে রাজগণের শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখ পাওয়া যায়। উপনিষদেও আছে যে রাজা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সহায়তা করবেন। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ব্রাহ্মণগণের বসতি ও বৃত্তির ব্যবস্থা রাজগণের কর্তব্য বলে' বর্ণনা করা হয়েছে।

মহাভারতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে নগরের মধ্যে শিক্ষার্থিদের জন্য আশ্রম নির্মাণ করতে অনুরোধ করেছেন। কৌটিল্য বলেছেন যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে অরণ্য দান করা হবে ও বৈদিক পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট উৎপাদনযুক্ত, কর ও দণ্ড হতে মুক্ত, ব্রহ্মদেয় ভূমি দেওয়া হবে। এতদ্ভিন্ন তিনি ব্রাহ্মণকে দেয় ব্রহ্মবৃত্তি, বংশানুক্রমিক বৈদ্যকে দেয় 'বৈদ্যার্থ' গুরুশিষ্যের ব্যয়নির্বাহার্থ দেয় 'অগ্রহারগ্রাম' ও পাঁচশত থেকে সহস্র পণ পর্যন্ত অর্থবৃত্তির বিধান দিয়েছেন। শুক্রনীতিসারে আছে যে রাজা দান ও মানের দ্বারা পাণ্ডিত্যের উন্নতি করবেন। ব্রাহ্মণকে রাজকর দিতে হত না, কারণ তারা তার পরিবর্তে পুণ্যফলের অংশ দান করতো অপরপক্ষে রাজার পক্ষে মূর্খ ব্রাহ্মণের প্রতিপালন চোরের প্রতিপালনের ন্যায় গর্হিত কাজ বলে' গণ্য ছিল।

হিন্দুবৌদ্ধ উভয় রাজগণই ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য পণ্ডিতগণের সম্মান ও পরিপোষণ করতেন। অশোক তাঁর সাম্রাজ্যের বহুস্থলে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের জন্য মঠের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মিলিন্দ বা মিনাণ্ডার বৌদ্ধশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কনিষ্কের নাম ইতিহাসে বসুমিত্র, চরক, প্রভৃতি মহাপণ্ডিতের সংগে জড়িত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নবরত্নের পরিপালনের জন্য খ্যাত। গুপ্তরাজগণ নালন্দার প্রতিষ্ঠাতা ও আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হর্ষবর্ধন 'হর্ষচরিত'-রচয়িতা বাণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, হিউয়েনৎসাংকে সম্মানিত করেছিলেন ও জাতক-সংকলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন; তিনি রাজকরলব্ধ অর্থের একপাদ পণ্ডিতগণের পুরস্কারে ব্যয় করতেন। পালরাজগণ অতীশ, বীরদেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্মপাল বিক্রমশীলার ও গোপাল ওদন্তপুরীর প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্র ও আত্মাস্বরূপ ছিলেন 'গুরু'। কালক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর গুরুকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হ'ত। যিনি গর্ভাধান থেকে আরম্ভ করে' সমুদয় সংস্কারের অনুষ্ঠান করতেন তাঁকে বলা হত' 'গুরু,' যিনি উপনয়নের পর থেকে বৈদিক-শিক্ষা দিতেন, তিনি ছিলেন 'আচার্য' আর যিনি অর্থবিনিময়ে বিদ্যাদান করতেন তিনি হ'তেন 'উপাধ্যায়'.

তপোবন ও গুরুকুলব্যবস্থায় গুরু স্বগৃহে, গার্হস্থ্য -পরিবেশে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর কোনো নির্দিষ্ট বেতন ছিলনা। শিষ্যগণের নিকট লব্ধ দক্ষিণা, সাধারণের নিকট লব্ধ ভিক্ষা ও রাজানুগ্রহলব্ধ দানের দ্বারা তাঁর আশ্রমের ব্যয় নির্বাহিত হত'।

অর্থবিনিময়ে শিক্ষার ব্যবস্থা এ-দেশে ধীরে ধীরে প্রচলিত হয়। জাতকে রাজপুত্রদ্বারা সহস্র কার্ষাপণ গুরুকে দান করার বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থসন্তান নিশ্চয় এত প্রচুর অর্থদানে শিক্ষা-লাভ করতে পারতোনা, তাই বিদ্যার্থিদের মধ্যে যারা অর্থমূল্যে শিক্ষা-লাভ করতো আর যারা শ্রমমূল্যে শিক্ষালাভ করতো এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো দেবমন্দিরের সংগে সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের উদ্ভব হয়েছিল। সেগুলিতে ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ বেদাদির অধ্যয়ন করতেন। প্রাচীন শিলালিপি থেকে জানা যায় যে এখানকার গুরুগণ বেতনভুক্ ছিলেন। বিভিন্ন শিক্ষক দৈনিক বিভিন্ন পরিমাণ ধান পেতেন। এই ওজনের হিসাবে প্রতীয়মান হয় যে তাঁদের বেতন যথেষ্ট হ'লেও প্রচুর ছিলনা। এন্নয়িরম ও মাল্কাপুরমের বিদ্যাপীঠের বেতনের হিসাব থেকে জানা যায় যে অধ্যাপকগণ যা পেতেন তা একটি সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারের সরল জীবন ধারণের প্রয়োজনের প্রায় দ্বিগুণ

ছিল। মুসলমান শাসনের কালে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা রাজানুগ্রহ বর্জিত ও অত্যাচারিত হওয়ায় ক্রমশ, বৃটিশ শাসনের প্রাক্কাল পর্যন্ত এঁদের অবস্থা এত হীন হয়ে পড়ে যে কোনোক্রমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা মাত্র হ'ত।

প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে যে ব্রাহ্মণ গুরুগণ অনেক সময়ে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরাপর জাতির শিক্ষাব্যবস্থারও আধিপত্য করতেন। অপরপক্ষে প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়রাজগণও মাঝে মাঝে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন এবং ব্রাহ্মণের পর্যন্ত গুরুস্থানীয় হয়েছেন। তবে সেগুলিকে ব্যতিক্রম রূপেই গণনা করা যায়।

শিক্ষা ব্রাহ্মণের জাতিগত ধর্ম হ'লেও শিক্ষণ শিক্ষার কোনো পৃথক ব্যবস্থা ছিলনা। অর্জিত বিদ্যার খ্যাতিই তাঁদের ব্যবসায়ের মূলধন-স্বরূপ ছিল এবং তর্কসভা ইত্যাদিতে এই খ্যাতি বজায় রাখার জন্য তাঁদের সর্বদা সচেতন থাকতে হ'ত।

ক্ষত্রিয়ের শিক্ষা

(ব্রাহ্মণের মতো ক্ষত্রিয়গণও প্রথমাবধি এক দৃঢ়বদ্ধ জাতি ছিলেন।) গুণানুসারে যুদ্ধ ও শাসনকার্য ক্ষত্রিয়ের জীবিকা ছিল, কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সেনাদলে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্রেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত ক্ষত্রিয়সাধারণের সঙ্ঘবদ্ধতার ও আয়ুধজীবি-সংঘগুলির সভ্যপদ বংশানুক্রমিক হওয়ার জন্য ক্ষাত্রধর্ম ক্রমশ জন্মগত হয়ে পড়ে) অর্থ শাস্ত্রে এইরূপ সংঘের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(দ্বি-জাতিগণের মধ্যে দ্বিতীয় জাতিরূপে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নের অধিকার ছিল) উপনিষদে চিত্রগাংগায়নি, অজাতশত্রু প্রবাহন জৈবালি, অশ্বপতি কৈকেয়' রাজপুত্র দেবপি প্রভৃতি 'ব্রহ্মবিদ' ক্ষত্রিয়ের নামোল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাঁরা পৌরাহিত্য করতেন বলে' জানা যায়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে জনক, বৃহদ্রথ, জনশ্রুতি প্রভৃতির পৌরোহিত্যের বর্ণনা দেখা যায়। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগে (খৃঃ পূঃ আঃ ৮০০-৫০০) রাজগণ বেদালোচনা করতেন। (সূত্রের সময়েও (খৃঃ পূঃ আঃ ৫০০) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিজাতির উপনয়নের পর গুরুগৃহে বেদাধ্যয়নের বিবরণ পাওয়া যায় ; এদের উপনয়নের বয়স ও ব্রহ্মচর্যবেশের পার্থক্য ছিল মাত্র।)

(কালক্রমে ক্ষত্রিয়ের জাতিগত বৃত্তিশিক্ষার জটিলতাবৃদ্ধির সংগে বেদাধ্যয়নের আগ্রহ কমে যায় ও শেষ পর্যন্ত ওই অধিকার অস্বীকৃত হয়।

বৈদিক উপনয়ন ভিন্ন ক্ষত্রিয়ের জাতিগত সংস্কার ধানুর্বেদিক উপনয়নের বিবরণ বশিষ্ঠের ধনুর্বেদসংহিতায় পাওয়া যায়। এই অনুষ্ঠানে

ব্রাহ্মণভোজন ও অস্ত্রগুরুকে উপঢৌকনদানের সংগে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করে' শিক্ষার্থীকে অস্ত্রদান করা হ'ত,—ব্রাহ্মণকে ধনু, ক্ষত্রিয়কে তরবারি, বৈশ্যকে ভল্ল ও শূদ্রকে গদা দেওয়া হ'ত। এ-ক্ষেত্রেও ক্ষাত্রবিদ্যার সাধনায় চারিজাতির উল্লেখ লক্ষ্যণীয়।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ক্ষাত্রবিদ্যাশিক্ষার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে সামরিক কৌশলের প্রতিযোগিতার উল্লেখ আছে। মহাভারতে পাণ্ডব ও কৌরবগণের অস্ত্রশিক্ষার বিবরণ আছে। রথ, অশ্ব ও গজের ব্যবহার, পদব্রজে যুদ্ধ, লম্ফন, সন্তরণ প্রভৃতি এই শিক্ষার অন্তর্গত ছিল। অস্ত্রের মধ্যে গদা, তরবারি, ভল্ল, তীরধনু প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আরেকটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে পাণ্ডবদিগের অস্ত্রগুরু কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্য উভয়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন।

রামায়ণে রাজপুত্রদের তন্ত্র, বেদ ও ধর্মশিক্ষার কথা আছে। রাম উপনয়নান্তে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালন করে' স্নাতকরূপে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক পাঁচশতে বেদাংগের পরিণতি হয়। বেদাংগের অন্তর্গত কল্পশাস্ত্রে নীতিশাস্ত্র, অর্থবিভাগ, বার্ত্ত, দণ্ডনীতি, সংগীত, কাব্য, লেখন, অংকণ প্রভৃতি রাজকীয় চর্চার উল্লেখ পাওয়া যায়।

কল্পের অনুসরণে বিভিন্ন ধর্মসূত্রের রচনা হয়। এগুলিতে রাজগণের কর্তব্যসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে। গৌতমের ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে রাজাকে তিনটি ধর্মশাস্ত্র ও ন্যায় আয়ত্ত করে' বেদ, ধর্মশাস্ত্র, অংগ ও পুরাণের অনুসারে রাজ্যশাসন করতে হবে। এ-ভিন্ন অস্ত্রবিদ্যা ও সমরকৌশলের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়েছে।

ধর্মসূত্রের ভিত্তিতে রাজধর্মের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ নীতি ও অর্থশাস্ত্রের বিবর্তন হয়। খৃষ্টপূর্ব পাঁচশত থেকে আরম্ভ করে' মৌর্যবংশের

উত্থানের সময় পর্যন্ত (খৃষ্টপূর্ব ৩২১) এই দুই শাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করে। সম্ভবত পারস্য আক্রমণ (খৃষ্টপূর্ব ৫২১-৪৮৫) ও আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের ফলে (খৃষ্টপূর্ব ৩২৭-৩২৪) আত্মরক্ষার্থে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এই পরিণতি হয়েছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজপুত্রের শিক্ষার অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। মৌর্যবংশের সহায়ক ব্রাহ্মণ চাণক্যের এই গ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব ৩২১ থেকে ২৯০ এর মধ্যে কোনো সময়ে রচিত হয়েছিল। এতে রাজপুত্রগণের শিক্ষণীয় চারিটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—অন্বীক্ষিকী, তিনবেদ, বার্ত ও দণ্ডনীতি। অন্বীক্ষিকী ছিল সাংখ্য, যোগ ও লোকায়তদর্শনের সমন্বয়; বার্ত ছিল কৃষি, পশুজনন ও বাণিজ্যের বিজ্ঞান এবং দণ্ডনীতি রাজ্যশাসন ও শত্রুদমনের নীতি।

কৌটিল্য রাজপুত্রের শিক্ষাবিধির বিবরণ দিয়েছেন। চৌলসংস্কার ও চূড়াবন্ধের পর রাজপুত্ররা অক্ষর ও অংক শিক্ষা করতো। উপনয়নের পর তারা প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের কাছে তিনবেদ ও অন্বীক্ষিকী পড়তো, রাজকীয় বিভাগের কর্তৃবর্গের কাছে বার্ত ও নীতিজ্ঞদের কাছে দণ্ডনীতি শিখতো। রাজপুত্রগণ ষোড়শ বৎসর বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন করতো, তারপর স্নাতকসংস্কারের অনুষ্ঠান করে' বিবাহ করতো। এর থেকে বোঝা যায় যে ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী একাদশ বৎসর বয়সে রাজপুত্রের উপনয়ন হয়ে থাকলে তার ব্রহ্মচর্যকাল অতি সংক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমেও তাদের শিক্ষা চলতো এবং বাস্তবিক কর্মক্ষেত্রে তারা বার্ত ও দণ্ডনীতির শিক্ষালাভ করতো।

রাজপুত্রের দৈনিক কর্মসূচিতে প্রত্যেক দিনকে ১২ ঘন্টার আটটি অংশে বিভক্ত করা হ'ত। সকালে তারা হস্তী, অশ্ব, রথ ও অস্ত্রশস্ত্রের সমভিব্যাহারে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করতো। অপরাহ্ণে ইতিহাস পাঠ

করতো। পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের সমন্বয়ে ইতিহাস ছিল। মহাকাব্য ও পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি নীতিগর্ভ কাহিনীসমূহ পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা ও উদাহরণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজনীতি ও ব্যবহার ধর্মশাস্ত্রের এবং বার্ত ও দণ্ডনীতি অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিষ্যগণ প্রতিদিন নূতন পাঠ গ্রহণ ও পুরাতন পাঠের পুনরাবৃত্তি এই দুইই করতো। উপরি-উক্ত পাঠ্য-তালিকার বিশেষত্ব এই যে এতে বেদের উল্লেখ নেই।

মনুসংহিতাতেও রাজপুত্রের শিক্ষার বিধান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে রাজপুত্রগণ বেদজ্ঞদের কাছে তিনটি ধর্মশাস্ত্র, প্রাচীন রাজ্য-শাসননীতি ও ন্যায়শাস্ত্র পড়বে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবে। এই শিক্ষার জন্য তাদের ব্যাকরণ পড়বার প্রয়োজন হ'ত। অন্যদিকে, জনসাধারণের নিকট তাদের বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ের বিষয় শিখতে হ'ত এবং ধনু-বিদ্যার চর্চার জন্য মৃগয়ার প্রয়োজন হ'ত। মনুর মতে নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি রাজপুত্রদের বিষয়বহির্ভূত ছিল।

এই আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে নীতি ও অর্থশাস্ত্র রাজপুত্রদের প্রধান পাঠ্য ছিল এবং তারা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করতো। শেষোক্ত দুটি বিষয় বার্তের অন্তর্গত ছিল।

খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ভিত্তিতে রচিত কামন্দকীনীতিসার রাজপুত্রগণের শিক্ষায় প্রাধান্য লাভ করে।

রাজকুলে বিলাসবৃদ্ধির সংগে উপরিউক্ত প্রকারের শিক্ষাবিধিগুলি রাজপুত্রগণের ওপর প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল বলে' গল্পচ্ছলে শিক্ষাদানপদ্ধতির প্রচলন হয়। এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ তন্ত্রাখ্যায়িকার

কালনির্দেশ করা যায়নি। পঞ্চতন্ত্র খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা। হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি আরো পরে রচিত হয়। রামায়ণ মহাভারতের নীতিমূলক কাহিনীগুলিও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ'ত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে রাজস্থানের চারণেরা আঞ্চলিক ভাষায় বীরকাহিনীর গান রচনা করে' প্রচার করতো।

ব্রাহ্মণের অসামান্য প্রভাব রাজকুলের শিক্ষার মধ্যে এক বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। রাজগণের শিক্ষণীয় শাস্ত্র, এমন কি শস্ত্রবিদ্যা পর্যন্ত ব্রাহ্মণের কুক্ষিগত ছিল। উপরন্তু রাজগুরুরূপে তাঁদের অসীম ক্ষমতা ছিল। কিরূপ ব্রাহ্মণকে রাজগুরু করা উচিত তার বিবরণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র ও শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের সম্মান ও প্রতিপালন রাজধর্মের আবশ্যক অংগরূপে বিহিত হয়েছে।

রাজগণের শিক্ষার অপর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে তাতে একাধারে জ্ঞানিক ও কায়িক উভয় প্রকার শিক্ষার সমাবেশ হয়েছিল এবং কায়িক শিক্ষা লাভ করা হ'ত বাস্তবিক কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কালক্রমে এই শিক্ষার মহত্ত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

ক্ষত্রিয়ের শিক্ষার তৃতীয় বিশেষত্ব এদের সামরিক নীতি সমূহ। এই নিয়মকানুনগুলিকে পাশ্চত্য শিভ্যালরির (Chivalry) নীতির সংগে তুলনা করা হয়েছে কিন্তু বস্তুত এগুলি তার চেয়ে উন্নত ছিল। পরাজিত, পলায়নপর ভীত বা আশ্রয়প্রার্থী শত্রুকে, যুদ্ধান্তে বিপক্ষের একক জীবিত রথীকে এবং উন্মত্ত ব্যক্তি, শিশু, নারী ও বৃদ্ধকে আঘাত করা ধনুর্বেদমতে ক্ষাত্রনীতিবিরুদ্ধ ছিল। ন্যায়যুদ্ধের নানা কঠিন নিয়ম ছিল।

রাজপুতজাতির মধ্যে সামন্ততন্ত্রের সংগে জড়িত হয়ে এক সুসংবদ্ধ সামরিক শিক্ষার রীতি গড়ে' উঠেছিল। রাজপুতগণ 'খড়্গাবান্ধাই'

অনুষ্ঠান পালন করতো। কেউ কেউ তাকে ধানুর্বেদিক উপনয়নের সংগে আর কেউ কেউ অস্ত্রশিক্ষার সমাবর্তনোৎসবের সংগে তুলনা করেন। এই অনুষ্ঠান উনবিংশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল এবং এর পূর্বেও ক্ষত্রিয় যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে প্রচলিত ছুরিকাবন্ধ, অস্ত্র পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজকুলের ও সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ ভিন্ন সাধারণ ক্ষত্রিয় সন্তানের শিক্ষার ভার প্রধানত ক্ষত্রিয়গণের সংগঠন 'আয়ুধজীবিসংঘ' গুলির ওপর ন্যস্ত ছিল। এ ভিন্ন আংশিক ভাবে পারিবারিক ব্যবস্থায় এবং শেষে রাজসেনাদলের অভ্যাসের মধ্যে যোদ্ধৃবর্গের শিক্ষা হ'ত। ভারতে মৌর্যযুগ থেকে রাষ্ট্রীয় সেনাদলের উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু সেনাদলের শিক্ষার উল্লেখ পূর্ববর্তী গ্রন্থাদিতেও পাওয়া যায়।'

রামায়ণে সেনাদলের নিয়মিত শিক্ষালাভের উল্লেখ আছে। মহাভারতেও অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র এক স্থলে বলেছেন যে তাঁর সেনাদল অশ্বারোহণ, দ্রুত গমন, উল্লম্ফন, মারামারি, দুর্গপ্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ প্রভৃতি বিদ্যা আয়ত্ত করেছে।

তখনকার সেনাদল 'চতুরংগ' হ'ত। মেগাস্থিনিস অশ্ব ও গজশালা এবং অস্ত্রাগারের উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আয়ুধাগার ও তার তত্ত্বাবধায়কের কথা আছে। শুক্রনীতিসারে শতজন শিক্ষিত সেনানীর নায়কত্বে দৈনিক সেনাপরিচালনের অভ্যাসের বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থে সুন্দর সেনাদলের গঠনের জন্য শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক এই তিন শিক্ষার কথা আছে এবং বলা হয়েছে যে সেনাদলকে উপযুক্ত শিক্ষা ও বেতন দিতে হবে, প্রতি সপ্তাহে সেনাদলের সম্মুখে সামরিক নীতি পাঠ করে' শোনাতে হবে এবং রাজা স্বয়ং শৌর্যবিদ্যা ও ধনুর্বেদের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করবেন।

(ক্ষত্রিয়সাধারণের শিক্ষার পরীক্ষার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না, পূর্বোল্লিখিত অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে তার সামান্য আভাষ পাওয়া যায়। অপরপক্ষে রাজপুত্রদের অস্ত্রপরীক্ষার উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে আছে। মহাভারতের সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা যায় যে রাজকুলজাত ভিন্ন অপর কারো এই পরীক্ষায় যোগ দেওয়ার অধিকার ছিলনা।)

বৈশ্যের শিক্ষা।

'বিট্' ধাতুজাত বৈশ্যের অর্থ বিরাট জন সমাজের সূচক। সেই অর্থে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কর্ম এবং দাসত্ব ব্যতীত অপর সকল জীবিকার উপায় আর্যসমাজের এই তৃতীয় জাতির বিষয়ীভূত ছিল। কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, মানুষ ও পশুর চিকিৎসা ও শিল্পাদি বহু জীবিকা বৈশ্যগণের অবলম্ব্য ছিল। দ্বিজাতির মধ্যে গণ্য হওয়ায় এদের বেদাধিকার ছিল, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মতো এদেরও জাতিগত কর্মের জটিলতাবৃদ্ধির সংগে বেদশিক্ষা সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে ও শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বিশ্বকর্মা এদের জাতিগত দেবতা।

কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যে যে সব বৈশ্যরা নিয়োজিত থাকতো তাদের কর্তব্যের বিবরণ মনুস্মৃতিতে পাওয়া যায়। এই বিবরণ অনুসারে উপরিউক্ত ব্যবসায় অনুসরণে অনিচ্ছা প্রকাশ বৈশ্যের অকর্তব্য ছিল এবং উক্ত কর্মে ইচ্ছুক বৈশ্যের বর্তমানে অন্য জাতির লোকের পক্ষে অনুরূপ জীবিকা অবলম্বন অবৈধ ছিল। বৈশ্যকে রত্ন, মুক্তা, প্রবাল, ধাতু, কার্পাশবস্ত্র, গন্ধ-দ্রব্য, মিষ্টান্ন প্রভৃতির মূল্য জানতে হ'ত; শস্যবপন-রীতি ও ক্ষেত্রের গুণাগুণ জানা তার পক্ষে আবশ্যক ছিল, সকল প্রকার মাপ ও ওজনের পরিচয় তাকে রাখতে হ'ত এবং সম্ভাব্য লাভক্ষতি ও পশুপালনের সুষ্ঠু উপায়-সমূহ তাকে বুঝতে হ'ত। এতদ্ভিন্ন ভৃত্যগণের উপযুক্ত বেতন; বিভিন্ন দেশবাসীর বিভিন্ন দ্রব্য সংরক্ষণের উপায় ও ক্রয় বিক্রয়ের নিয়ম-সমূহ তার জানার দরকার হ'ত।

এই বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে বৈশ্য সন্তানকে কৃষি ও পশু-পালন-পদ্ধতি, বাণিজ্যিক ভূগোল ও গণিত, বিভিন্ন ভাষা ও

ব্যবসায়বাণিজ্যের কার্যিক প্রয়োগ শিক্ষা করতে হ'ত। সম্ভবত তারা পৈতৃক ব্যবসায়ে নিযুক্ত থেকে নিতান্ত সাধারণ ও কার্যিকভাবে বিষয়গুলি শিখতো। এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তাই পারিবারিক শিক্ষা-ব্যবস্থা বলে' বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে বাণিজ্য-সংঘের (Trade Guilds) উল্লেখ পাওয়া যায়।) ক্ষেমেন্দ্রের লোক-প্রকাশে এই সংঘের প্রধানকে 'জট্টক;' 'সেট্ঠি' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। (ক্ষেত্র-বিশেষে এই সংঘগুলি শিক্ষানবীশী প্রথায় বৈশ্য-সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করতো।

ভারতের কোনো কোনো স্থানে মহাজনী বিদ্যালয়ের উদ্ভব হয়েছিল। কতকগুলি মহাজন বা শ্রেষ্ঠী একত্র হয়ে নিজ সন্তানগণের প্রাথমিক বাণিজ্যশিক্ষার জন্য এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত করতো। এখানে দলিল-দস্তাবেজ ও মহাজনী হিসাব শেখানো হ'ত। এখানকার প্রারব্ধ শিক্ষা পৈতৃক কর্মক্ষেত্রে, কার্যিক প্রয়োগে সমাপ্ত হ'ত। এই বিদ্যালয়ের উদ্ভব সম্ভবতঃ বহু প্রাচীনকালে হয়েছিল ও বৃটিশ রাজত্ব কাল পর্যন্ত এদের অস্তিত্ব বজায় ছিল।

বৌদ্ধশাস্ত্র মহাবগ্‌গে 'লেখা, গণনা ও রূপ' বৈশ্য-সন্তানের শিক্ষার বিষয়ীভূত বলে' বর্ণনা করা হয়েছে। লেখা অর্থে লিপি ও বিশিষ্ট লিখনরীতি ; বিশিষ্ট শৈলী ও বিভিন্ন প্রকারের দলিল-পত্র লিখতে শেখা এর অন্তর্গত ছিল। এই সম্পর্কে মাটির মোহর দেওয়া কাঠের ফলক, চামড়া, কাগজ, রেশম প্রভৃতি লিখবার উপকরণের উল্লেখ করা হয়েছে। গণনা হ'ল হিসাব ; লাভক্ষতি, আয়ব্যয়, নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা ও তাদের বেতন, দ্রব্যাদির মূল্য, বিনিময়ের হার, ওজনের হিসাব প্রভৃতি এর অন্তর্গত। এর সম্পর্কে গণনাশালা, তার অধ্যক্ষ ও হিসাবের পরীক্ষার (audit) ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। রূপ হ'ল মুদ্রাবিজ্ঞান ;

মুদ্রার উৎপাদন, পরিবর্তন ও বিনিময় এই বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। রাজগণ তাঁদের মুদ্রাশালায় রূপদর্শক বা রূপদক্ষের নিয়োগ করতেন।)

ক্ষেমেন্দ্রের লোকপ্রকাশে হুণ্ডি, প্রতিশ্রুতিলিপি, রাজকীয় বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি নানাপ্রকারের লেখনের আদর্শ দেওয়া আছে। কল্হনের রাজতরংগিনীতে কেরানির শিক্ষার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

(পশু ও মানবের চিকিৎসা বৈশ্যদের অবলম্বনীয় অপর একটি ব্যবসায় ছিল।) ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র আর্যদের ভারতে আগমনের প্রায় সমসাময়িক। খৃষ্টপূর্ব সাতশতের থেকে তৃতীয়-চতুর্থ শতকে এর অভ্যুত্থান ও খৃষ্টীয় নবম শতক অবধি এর উন্নতির কাল বলে' ধারণা করা হয়। প্রথমে অনার্যদের সংগে যুদ্ধবিগ্রহ ও আত্মকলহে এবং তৎপরে বৌদ্ধধর্মের সেবাদর্শের প্রভাবে ভারতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি হয়।

মহাভারতে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও যুদ্ধক্ষেত্রের সেবাবাহিনীর উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ এই বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন এবং নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বরপুত্র বলে' পরিগণিত হতেন।

(তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয় (খৃষ্টপূর্ব ১৫০০—খৃষ্টীয় ১৭৬) চিকিৎসা-বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। মহাবগ্‌গে উল্লেখ আছে যে জীবক এই স্থানে শিক্ষালাভ করেন। সাত বৎসর শিক্ষার পর তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর পাঠের মধ্যে শল্যচিকিৎসা ও ঔষধপ্রয়োগ উভয়ের কার্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পাঠ্যপুস্তকগুলি সংস্কৃতে নিবদ্ধ ছিল। শেষ পরীক্ষার সময়ে তাঁকে তক্ষশীলার চতুষ্পার্শ্বস্থ ১৫ মাইল পরিধির অন্তর্গত স্থানের উদ্ভিদ্-সমূহের ঔষধ-মূল্য বিচার করতে বলা হয়েছিল। চার বৎসর গবেষণার পর তিনি উত্তর দেন যে এমন কোনো উদ্ভিজ্জ নেই যা ঔষধগুণ-বর্জিত।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (খৃষ্টপূর্ব ৩২৫-৩২০) সময়ে রাজকীয় চিকিৎসা-বিভাগ ছিল। বৌদ্ধযুগে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন চিকিৎসালয়গুলিতে এবং নালন্দা ও বিক্রমশীলায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'ত।)

গ্রীক লেখক ষ্ট্রাবো (Strabo) খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে ভারতীয় চিকিৎসকদের প্রশংসা করেছেন ও কথিত আছে যে গ্রীকগণ rhinoplasty বা নকল নাকের নির্মাণশিল্প এদেশ থেকে শিক্ষা করেন।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বগদাদের খলিফা হারুণ-অর-রশীদ চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভারতে লোক পাঠিয়েছিলেন এবং কতকগুলি ভারতীয় চিকিৎসককে তার রাজ্যে আহ্বান করেছিলেন। এই সময়ে চিকিৎসা-শাস্ত্রের বহু সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ও পারসী ভাষায় অনূদিত হয়।

রাজা কণিষ্কের চিকিৎসক চরকের (খৃঃ অাঃ ১২০) রচিত চরক-সংহিতায় বলা হয়েছে যে প্রথমে ব্রহ্মা দক্ষকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন, দক্ষ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, তাঁরা ইন্দ্রকে, ইন্দ্র ভরদ্বাজকে এবং ভরদ্বাজ পুনর্বসু, আত্রেয় প্রভৃতিকে শিক্ষা দেন। আত্রেয়ের জীবক প্রভৃতি অনেক শিষ্য ছিলেন। খৃষ্টীয় তৃতীয়চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক সুশ্রুতের বিষয়ে শোনা যায় যে তাঁর গুরু বারাণসীর রাজা দিবোদাস ধন্বন্তরির অবতাররূপে খ্যাত ছিলেন।

চরকসংহিতায় চিকিৎসালয়ের কর্মিবৃন্দের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে তাদের ধার্মিক, পবিত্র, প্রীতিশীল, বুদ্ধিমান, উদার, সেবায় নিপুণ, কর্মে পটু, অন্নব্যঞ্জনরন্ধনে, স্নান করানোয়, মালিকারচনায় শিক্ষিত এবং রোগীকে ওঠানো ও সরানোর বিদ্যায়, বিছানা তৈয়ারি ও পরিষ্কার করায় এবং ঔষধপ্রস্তুত করায় অভিজ্ঞ হ'তে হবে। এদের কাজে ইচ্ছুক হতে হবে এবং বিনা বিরক্তিতে আজ্ঞা পালন করতে হবে।

মহাবগ্গে রোগীর সেবকের গুণ বর্ণিত আছে। সে নিপুণ ও ঔষধ নির্বাচনক্ষম হবে, পথ্যের উপযোগিতা বিচার করে' পরিবেষণ করতে পারবে, ভালোবাসায় প্রণোদিত হয়ে সেবা করবে, মলমূত্রাদি পরিষ্কার করতে ঘৃণা করবেনা এবং ধর্মালোচনার দ্বারা রোগীকে আনন্দ দিতে পারবে।

নন্দীপুরাণে চিকিৎসকের গুণ বর্ণিত আছে। তার ধর্ম ও সংস্কারের জ্ঞান থাকা চাই, ঔষধের ফলাফল জানা চাই, ওষধি ও মূলের রং চেনা চাই, বিভিন্ন ওষধির উৎপাদনের ঋতু জানা চাই, বিভিন্ন রস, শালিধান্য, মাংস, ঔষধ প্রভৃতির গুণ জানা চাই, ঔষধ প্রস্তুত করতে পারা চাই, বুদ্ধি ও স্বভাবদ্বারা মানুষের শরীর বোঝা চাই, রোগলক্ষণ চেনা চাই, রোগের ফল জানা চাই, অষ্টাংগ আয়ুর্বেদের এবং গার্হস্থ্য ঔষধাবলির পূর্ণজ্ঞান থাকা চাই।

আয়ুর্বেদ উপবেদের মধ্যে গণ্য ছিল। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকারগণ আয়ুর্বেদিক উপনয়নের কথা লিখে গিয়েছেন বৈশ্য ভিন্ন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণও এই বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

মানুষ ভিন্ন পশুর চিকিৎসাও ভারতে প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল। মহাভারতে 'অশ্বসূত্র' ও 'গজসূত্রে'র উল্লেখ করা হয়েছে। এবং পশুচিকিৎসকরূপে নকুল ও সহদেবের নাম পাওয়া যায়। নকুলের নামে প্রচলিত অশ্বচিকিৎসার গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায়।

কৌটিল্য বলেছেন যে রাজগণের অভিজ্ঞ অশ্ব ও হস্তীর চিকিৎসক নিযুক্ত করা উচিত। তিনি গাছপালার চিকিৎসারও উল্লেখ করেছেন।

অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তিনি তাঁর রাজ্যে পশু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন।

পালকাপ্যের রচিত হস্তী-আয়ুর্বেদ পাওয়া যায়। তিনি নাকি

অংগরাজ রোমপাদের পশুচিকিৎসক ছিলেন। অগ্নিপুরাণে বৃক্ষায়ুর্বেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৩৮১ খৃষ্টাব্দে গয়াস্উদ্দিন মাহ্মুদ শাহ্ কোনো ব্রাহ্মণের রচিত পশুচিকিৎসাগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

বৈশ্যসমাজের তৃতীয় ও বিরাট শাখা ছিল শিল্পিগণ। প্রাচীনকালের গ্রামীন ব্যবস্থায় প্রত্যেক শিল্পীর নির্দিষ্ট স্থান ছিল। কুমোর, কামার সেক্‌রা, ছুতোর, দর্জি, ধোপা, নাপিত, মেথর প্রত্যেকেই সমাজের অপরিহার্য অংগ ছিল। এদের মধ্যে মেথর ভিন্ন সবাই বৈশ্য ছিল।

এই শিল্পগুলির ইতিহাস অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদসংহিতায়, ছুতোর, তাঁতি, জলসেচক, কামার, ঋভু (রথনির্মাতা), নৌকানির্মাণকারী, কবি, পুরোহিত প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ীর উল্লেখ আছে।

তক্ষশীলায় খৃষ্টপূর্ব আটশত থেকে আড়াইশতের মধ্যে গরুড়বিদ্যা, সর্পবিদ্যা, প্রতিমানির্মাণ প্রভৃতি বিষয় শেখানো হ'ত। খনি ও ধাতু-গলানোর কাজ কার্যক্ষেত্রে শিক্ষানবীশীর দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। রথ, রথচক্র, তীরের ফলা, প্রভৃতি নির্মাণের কারখানারও উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতাকাটা, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিল্পের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল।

শিল্পিগণ শিল্পিসংঘের (guilds) মধ্যে সংঘবদ্ধ হ'ত। সংঘগুলির সভ্যপদ পুরুষানুক্রমিক ছিল, কিন্তু নৈপুণ্যবিচারে বাহিরের লোকও গৃহীত হ'ত। সাধারণত পুত্র পিতার নিকট শিল্পশিক্ষা নিত এবং পিতার মৃত্যুর পর সংঘে তার স্থান অধিকার করতো। সংঘগুলি চাঁদা তুলতো, জরিমানা করতো, কত ঘণ্টা ও কতখানি কাজ হবে, উৎপন্নদ্রব্যের আকৃতি ও গুণ কি হবে, সব নির্ধারিত করে' দিত। এরা পারস্পরিক সহায়তা ও নানারূপ পুণ্যকর্মের ব্যবস্থা করতো। প্রধান মহাজন ও শ্রেষ্ঠিগণ সংঘগুলির নেতৃত্ব করতেন।

এইরূপ সংঘের উল্লেখ রামায়ণে আছে। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে

এদের উল্লেখ করেছেন। আবার বৃটিশশাসনের প্রথম দিকেও এদের অস্তিত্ব ছিল।

সংঘচালিত শিক্ষানবীশী ব্যবস্থার যে বর্ণনা নারদসংহিতায় পাওয়া যায় তার থেকে বুঝতে পারি যে নির্ধারিতকালের জন্য শিক্ষানবীশীর চুক্তি করা হ'ত এবং এই চুক্তির পূরণের জন্য গুরুশিষ্য উভয়পক্ষের বাধ্যতা থাকতো। নির্ধারিতকালের উৎপন্নদ্রব্যে গুরুর অধিকার থাকতো। পলাতক শিষ্যের বলপূর্বক প্রত্যানয়নের এবং গুরুর ত্রুটির ক্ষেত্রে শিষ্যের শিক্ষানবীশী ত্যাগের অধিকার ছিল। শিষ্যের পক্ষে গুরুর বশ্যতা কর্তব্য ছিল এবং গুরুশিষ্যের মধ্যে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ ছিল। শিক্ষানবীশী গ্রহণ করতে হ'লে শিষ্যের আত্মীয়স্বজনের অনুমতির প্রয়োজন হ'ত। শিক্ষা হত বাস্তবিক কর্মক্ষেত্রে, হাতেকলমে।

পিতার বর্তমানে সন্তান সাধারণত তার কাছে শিক্ষালাভ করতো, তদভাবে শিক্ষানবীশী ব্যবস্থার প্রয়োজন হ'ত। এইদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে বৈশ্যের শিক্ষাব্যবস্থার গার্হস্থ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক এই দুই রূপ ছিল কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার পটভূমিও গার্হস্থ্যপ্রকৃতির ছিল। অবশ্য কোনো কোনো শিল্পিসংঘের দ্বারা বিরাট প্রতিষ্ঠানেরও সৃষ্টি হয়েছিল, যথা, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বীরবলনগরের শিল্পিসংঘকর্তৃক এক শিল্পমহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আগে বলা হয়েছে প্রাচীনকালের গ্রাম্য ব্যবস্থায় প্রত্যেক কর্মীর নিদিষ্ট স্থান ছিল। তাদের স্থানই যে কেবল নির্দিষ্ট ছিল তা নয় গ্রামের উৎপন্নদ্রব্যে ও সামাজিক ভাণ্ডারে এই সব কর্মীদের প্রাপ্য থাকতো এবং তাদের দায়িত্ব ও অধিকার সমাজের দ্বারা নির্ধারিত থাকতো।

এ-ছাড়া প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্পিগণ রাজা ও সামন্তরাজগণের দ্বারা কর্মে নিয়োজিত ও পৃষ্ঠপোষিত হ'ত। মন্দির ও মঠের

কর্তৃপক্ষগণও এদের নিযুক্ত করতেন। এবসব শিল্পী ও কারিকরদের পদ পুরুষানুক্রমিক থাকতো।

রাজা অশোকের সময় থেকে রাজরক্ষিত শিল্পিদের কথা জানতে পাওয়া যায়। মুসলমান রাজগণও শিল্পিদের নিযুক্ত করতেন। ফিরোজ-শাহ্ তোঘলক রাজকীয় শিল্পবিভাগ স্থাপিত করেছিলেন এবং স্বয়ং তাঁর ক্রীতদাসদের শিল্পশিক্ষার তত্ত্বাবধান করতেন। আকবর শিল্প-বিভাগ স্থাপন করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে কারখানাগুলির পরিদর্শন করতেন। স্যর টমাস্ রো জাহাংগীর ও শাজাহানের সময়ের শিল্পোন্নতির কথা লিখে গেছেন।

ধনী ও শক্তিমানের এই পৃষ্ঠপোষকতা যে নিছক ভালো ছিল তা নয়। তাঁরা শিল্পী ও কারিকরদের ভয় দেখিয়ে, জুলুম করে' বেগার খাটাতেন। অনেক সময়ে নামকরা শিল্পিদের আটক করে' রেখে অতিরিক্ত পরিশ্রম করানো হ'ত। এতে শিল্পের আপাত-উন্নতি হ'লেও শিল্পীর অনিষ্ট হ'ত। বর্নিয়র ও আবে ডুবোয়া এইরূপ জুলুম ও বেগারের বিবরণ দিয়েছেন।

জাতিভেদ-প্রথা শিল্পোন্নতির কিছুটা সহায়ক ছিল, কারণ এর দ্বারা নৈপুণ্য পুরুষানুক্রমিত হয়ে উৎকর্ষ লাভ করতো। অপরপক্ষে জাতি-ভেদের কাঠিন্যে অনেক সময়ে মৌলিক প্রতিভা খর্ব হ'ত।

শিক্ষার বিষয়বস্তু শিল্পানুযায়ী বিভিন্ন হ'ত কিন্তু প্রায় প্রত্যেক শিল্পের সংগেই কতকগুলি আনুসংগিক শিক্ষার প্রয়োজন জড়িত থাকতো।

প্রথমত, চিত্রাংকন সমস্ত কারুকার্যের মূলীভূত শিল্পরূপে শিক্ষণীয় ছিল। কিন্তু এই চিত্রাংকনপ্রথা প্রকৃতির অনুকারী ছিল না, ঐতিহ্য-শাসিত, জড় ও যান্ত্রিক হয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয়ত, লেখাপড়া। কোনো কোনো শিল্পের সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল, যথা, গৃহনির্মাতার ছিল বাস্তশিল্প। অথর্ব বেদে এইরূপ বত্রিশটি শিল্প-শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু কালক্রমে এইগুলি অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া শিল্পিদের কারুকার্য পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদিকে অবলম্বন করে' অংকিত হ'ত বলে' তাদের মহাকাব্য, পুরাণ, পল্লী-কাহিনী, ব্রতকথা প্রভৃতি জানতে হ'ত। অবশ্য কথকতা, ব্রত কথা, পালা গান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এ-সব বিষয়ের প্রচারের সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকাতে এরা এগুলি মৌখিকভাবে শিখতে পারতো, এর জন্য তাদের লেখাপড়া শিখবার প্রয়োজন হ'ত না।

এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থায় শিল্পিগণের সাধারণ শিক্ষা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং তজ্জনিত নিরক্ষরতার ফলে শিল্পিদের মধ্যে অনেক শ্রেণীরই অধঃপতন ঘটে।

কৃষি, বাণিজ্য, চিকিৎসা, শিল্প প্রভৃতি সবগুলিই বৈশ্যকর্ম হলেও কালক্রমে বৈশ্য সমাজ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে' যায় এবং তাদের মধ্যে অনেকেই সমাজে নিম্নস্থানে স্থাপিত হয়, যথা বেণে, চাষা, কামার, ছুতোর ইত্যাদি।)

স্ত্রী শিক্ষা।

বেদ ব্রাহ্মণের যুগে ভারতে আর্যনারীর স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট ছিল। কন্যাকে শিক্ষিত করে' শিক্ষিত পাত্রের হাতে সমর্পণ করাই ছিল আদর্শ। বিবাহকালে নারীর স্বামিনির্বাচনের অধিকার ছিল, বাল্য বিবাহ ও বৈধব্যাচারের বাধ্যতা ছিল না। স্ত্রী সহকারে ভিন্ন পুরুষ যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারতো না এবং অবিবাহিত পুরুষের যজ্ঞাধিকার থাকতো না। শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে যে স্ত্রী ও পুরুষ পৃথকভাবে অর্ধাংগ মাত্র এবং একত্রে সম্পূর্ণ।

যজ্ঞাধিকারিণী হওয়ার ফলে নারীকে বেদমন্ত্র জানতে হ'ত। তারা উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য পালন করতো, মন্ত্রবিদ্ উপাধি লাভ করতো। অথর্ববেদে ব্রহ্মচারিণীদের বিবরণ পাওয়া যায় এবং বিদুষী কন্যা লাভ করতে হ'লে কি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল তারও বিবরণ আছে। বিশ্ববারা, অপালা শাশ্বতী, লোপামুদ্রা প্রভৃতি নারী ঋগ্বেদের সংহিতা রচনা করেছেন, তাঁদের বলা হয়েছে মন্ত্রদৃক্।

এই বৈদিক যুগেই নারীর অবস্থার অবনতি হ'তে আরম্ভ করে। ঋগ্বেদের এক শ্লোকে নারীকে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও সংযমহীন বলে' বর্ণনা হয়েছে। শতপথব্রাহ্মণে নারীর নৃত্যগীতাদি চারুকলার অনুশীলনের উপযোগিতার কথা বলা হয়েছে।

উপনিষদ থেকে মহাকাব্যের কাল পর্যন্ত (খৃষ্ট পূর্ব ৮০০-২০০) একদিকে নারীর প্রাচীন গৌরবের কিছু অবশিষ্ট ছিল আর অপর দিকে অবনতির ধারা অগ্রসর হয়ে' চলে।

তখন নারীর উপনয়নের ও যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার ছিল, কিন্তু

স্ত্রীর পালনীয় কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানেরও উদ্ভব হয়েছিল, যেগুলি তারা পুরুষের সহায়তা ভিন্ন করতো। নারী পতিপুত্র-সমন্বিতা হয়ে অগ্রহায়ণী উৎসব করতো আর নবান্নের সময়ে বেদমন্ত্র-সহকারে সীতা-যজ্ঞ করতো। রামায়ণ মহাভারতে বিজয়ের জন্য, স্বামীর মংগলকামনায় ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে নারীর করণীয় বিশেষ অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায়; তাছাড়া তারা সন্ধ্যা করতো। এ সবের জন্য বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োজন ছিল। কৌশল্যা, তারা, মন্দোদরী, সীতা প্রভৃতি মন্ত্রবিদ্ ছিলেন।

ধর্ম-সূত্রে ব্রহ্মচারিণী ও সদ্যোদ্বাহা এই দুই শ্রেণীর নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্মচারিণীরা ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতিতে জ্ঞান অর্জন করে' ব্রহ্মবাদিনী হ'ত। গার্গী জনকের রাজসভায় যাজ্ঞবল্ক্যের সংগে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করেছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। আত্রেয়ী বাল্মীকি ও অগস্ত্যের কাছে বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। এ-ছাড়া প্রথিতেয়ী, সুলভা, কাশকৃৎস্নী প্রভৃতি আরো ব্রহ্মবাদিনীর নাম পাওয়া যায়।

নারীরা স্বয়ংবরা হ'ত। বাসবদত্তা, চিত্রাংগদা, উলুপী, হিড়িম্বা প্রভৃতির কাহিনীতে স্বামি-মনোনয়নের বিষয়ে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য-অনার্যের বিবাহের উদাহরণগুলিও লক্ষ্যণীয়।

বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান ও ব্যাপক বিস্তারের ফলে সমাজে নারীর অবস্থার বহু পরিবর্তন হয়।

বুদ্ধদেব তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতৃস্বসা মহাপ্রজাপতি ও প্রিয়শিষ্য আনন্দের উপরোধে নারীকে সংঘারামে স্থান দিয়েছিলেন। এতে স্ত্রী-শিক্ষা-প্রচারের সহায়তা হয়।

ভিক্ষুগণের সংঘারামের অধীনে ভিক্ষুণীদের জন্য পৃথক মঠ থাকতো। ভিক্ষুণীদের শিক্ষাব্যবস্থা ভিক্ষুদের অধীন ছিল। ভিক্ষুদের অনুমোদন

ভিন্ন নারীরা সংঘারামে প্রবেশ করতে পারতো না। তারা ভিক্ষুদের নিকট শিক্ষালাভ করতো কিন্তু শ্রেষ্ঠতম স্থবিরগণের কাছে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ ছিল না।

এত অসুবিধার মধ্যেও অনেক ভিক্ষুণী খ্যাতনাম্নী হয়েছিলেন। থেরগাথার মধ্যে অনেক নারীর রচনা পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর নাটক মৃচ্ছকটিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীকে স্বাধীনভাবে রাজসভায় যাতায়াত করতে ও উপদেশ দিতে দেখা যায়। কোনো কোনো বিদুষী ভিক্ষুণী উপাধ্যায়া উপাধি নিয়ে শিক্ষকতা করতেন।

নূতন নূতন দেশাচারের প্রবর্তনে স্ত্রীস্বাধীনতা ক্রমশ খর্বীকৃত হয় এবং ধনী পরিবার ভিন্ন সাধারণ ভাবে স্ত্রীশিক্ষার পথ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

স্মৃতি ও পুরাণের যুগে (আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব ২০০ খৃষ্টীয় ১২০০) নারীর ক্রমবর্ধিত অবরোধের ফলে উপনয়নের প্রথা রহিত হয়ে যায়। মনুস্মৃতি নারীর বেদোচ্চারণের বিরোধী। এতে বেদমন্ত্র উচ্চারণ না করে' নারীর উপনয়নের বিধান দেওয়া হয়েছে এবং নারী-কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করতে নিষেধ করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে নারীর জন্য কেবলমাত্র প্রাক্-উপনয়ন সংস্কারসমূহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ক্রমশ বাল্য-বিবাহ-প্রথার প্রচলন হ'ল। মনুর মতে দ্বাদশ বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ সমর্থিত হ'লেও উপযুক্ত পাত্রের অভাবে তাকে অবিবাহিতা রাখায় আপত্তি ছিলনা। পরবর্তী স্মৃতিকারেরা সাত থেকে নয় বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহের সমর্থন করেন। আলবেরুনির বিবরণে (১১শ খৃঃ) জানা যায় যে বারো বছরের উর্ধে ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

উপনয়ন-প্রথা রহিত হওয়ায় ও বাল্যবিবাহের প্রচলনে স্ত্রী শিক্ষার

মূলে কুঠারাঘাত করা হয় এবং মনুস্মৃতির প্রণয়নে স্ত্রীস্বাধীনতার পথও রুদ্ধ হয়। মনুর মতে বালিকা, যুবতী এমন কি বৃদ্ধারও স্বাধীনভাবে কিছু করার অধিকার নাই। নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকবে। এদের আশ্রয় ত্যাগ করলে উভয় কুল কলংকিত হবে।)

(মনুর এইরূপ বিধানে সংসারের কাজই নারীর একমাত্র বৃত্তিরূপে নির্ধারিত হ'ল এবং তার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে গার্হস্থ্য ও বৃত্তিমূলক হয়ে পড়লো।) ঘৃত ও অগ্নির সংগে তুলনা করে' মনু অনাত্মীয় স্ত্রীপুরুষের সান্নিধ্য নিষিদ্ধ বলে' বিহিত করেছিলেন। তপোবনের ব্রহ্মচারিণীদের সহশিক্ষাব্যবস্থা যে তাঁর অনুমোদন পেতনা এ কথা বলাই বাহুল্য।

(নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে মনু বলেছেন যে স্বামী স্ত্রীকে তার অর্থের সংগ্রহ ও ব্যয়ে, সাংসারিক পরিচ্ছন্নতাবিধানে, ধর্মার্থের পরিপূরণে, আহারের ব্যবস্থায় ও গার্হস্থ্য তৈজসপত্রের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত রাখবে। এই অনুসারে সাধারণ নারীর শিক্ষা আরম্ভ হ'ত পিতৃগৃহে মাতৃসন্নিধানে এবং সম্পন্ন হ'ত শ্বশুরালয়ে, শাশুড়ীর তত্ত্বাবধানে। সাধারণ মৌখিক হিসাব, রন্ধন, পরিমার্জন প্রভৃতির শিক্ষাই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল এবং সাক্ষরতার প্রয়োজন অনুভূত হ'ত না।

বেদাধিকার থেকে বঞ্চিতা হওয়ার পর থেকে নারীর জন্য বিশেষ ব্রতানুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছিল, কিন্তু তার জন্যও সাক্ষরতার প্রয়োজন হ'ত না, ব্রতকথা, কথকতা ইত্যাদির মধ্যে দিয়েই প্রয়োজনীয় ছড়াগুলি তারা শিখে নিত।

অপর পক্ষে ধনিগৃহের মেয়েরা শিক্ষার আলোক থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয় নি।) রঘুবংশে অজের মুখে ইন্দুমতীর বর্ণনায় 'গৃহিনী সচীব সখী প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' এই উক্তিতে স্ত্রী শিক্ষার

সাংস্কৃতিক দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। (বাৎসায়নের কামশাস্ত্রে গীত, বাদ্য, নৃত্য, চিত্রাংকন, মাল্যরচনা গৃহ ও দেহ চর্চা প্রভৃতি ৬৪ কলা নারীর শিক্ষার উপযোগী বলে' বর্ণনা করা হয়েছে।

বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তরের সাক্ষ্যে জানা যায় যে খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে অভিজাতগৃহের মেয়েরা লিখতে, পড়তে, কবিতা রচনা করতে ও শাস্ত্র বুঝতে পারতো।)

হালের গাথাসপ্তশতীতে রেবা, রোহা, মাধবী, অনুলক্ষ্মী, পাহই, বদ্ধবতী, শশীপ্রভা প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের স্ত্রী কবির নামের তালিকা পাওয়া যায়। বিদুষী নারী কৃষ্ণা সরস্বতী নাকি গর্ব করে' বলেছিলেন যে দেবী সরস্বতী শ্বেতাংগী নন, কৃষ্ণবর্ণা। শীল ভট্টারিকা ও বিজয়াংকা নাকি কবিত্বখ্যাতিতে কেবল মাত্র কালিদাসের চেয়ে কম ছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মীরাবাই এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিবি রতন কাউর হিন্দী কবিতা রচনা করেছিলেন।

ওয়ার্ডের বিবরণে উনবিংশ শতাব্দীর হাতী বিদ্যালংকার নাম্নী এক কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবার কথা আছে যিনি সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে' কাশীতে গিয়ে অধ্যাপনা করতেন।

(রাজকুলের নারীদের সাধারণত এমন শিক্ষা দেওয়া হ'ত যাতে তারা রাজার মৃত্যু বা অনুপস্থিতিতে রাজ্যভার নিতে পারে। অস্ত্রশিক্ষাও এই শিক্ষার অন্তর্গত ছিল। ভারতের ইতিহাসে এর বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। সুলতানা রিজিয়ার কথা (১২৩৩-১২৪০) ইতিহাসবিশ্রুত। ষোড়শ শতাব্দীতে আহ্‌মদ্ নগরের চাঁদবিবি শুধু যুদ্ধই করেননি, তিনি চিত্রাংকন ও সংগীতনিপুণা ছিলেন এবং আরবী, পারসী, তুর্কী কানাড়া ও মরাঠী ভাষায় কথা বলতে পারতেন। ইন্দোরের রানি অহল্যাবাঈ (অষ্টাদশ শতাব্দী),

ঝাঁসীর রানি লক্ষ্মীবাঈ রানি ভবাণী, এঁদের নামও ইতিহাসে অমর।

মুসলমান নবাব ও সম্রাটগণের অন্তঃপুরে শিক্ষার প্রচলন ছিল। স্থলতান গিয়াস্থদ্দিন (১৪৬৯-১৫০০) অন্তঃপুরিকাদের জন্য শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করতেন। বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম 'হুমায়ুন-নামা' রচনা করেছিলেন এবং তাঁর পড়াশুনার জন্য একটি নিজস্ব গ্রন্থশালা ছিল। হুমায়ূনের ভাগিনেয়ী, আকবরের পত্নী সালিমা স্থলতানা পারস্যভাষায় পারদর্শিনী ছিলেন ও কবিতা রচনা করতেন। শাজাহানের দুই কন্যা জাহানারা ও জুবেদা বেগম বিদুষী ছিলেন, তাঁদের শিক্ষয়িত্রীর নাম ছিল সতি-উন্নীসা। আওরংজীবের কন্যা জিবুন্নীসা যেমন স্বেচ্ছাচারিণী, তেমনই বিদুষী ছিলেন।

দরিদ্র সমাজের মেয়েদের মধ্যে স্থতোকাটা, তাঁতবোনা ও নানা-প্রকার হস্তশিল্পের প্রচলন ছিল। বৈষ্ণবী ও ভিক্ষুণীরা পল্লীগাথা ও মাতৃভাষায় রচিত ধর্মসংগীত ভিন্ন মাঝে মাঝে সংস্কৃতেরও চর্চা করত।

আরেক শ্রেণীর নারী ভারতের ইতিহাসে অতি প্রাচীন যুগ থেকে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। বারবনিতা ও দেবদাসীরা অনেক সময়ে দুর্নীতিপূর্ণ জীবন যাপন করা সত্বেও রসিকতা ও বাক্-চাতুরীর জন্য বিখ্যাত ছিল এবং আবৃত্তি, নৃত্যগীতাদির শিক্ষা পেত।

বারবনিতারা প্রাচীনকালে রাজসভায় বিশেষ সম্মানের আসন পেত এবং রাজগৃহে মাল্যগ্রন্থন, কেশবিন্যাস প্রভৃতি নানা কাজে নিয়োজিত হ'ত। স্বয়ং রাজাকে পানীয়, গন্ধ ও মালা দেবার সম্মান তাদের ছিল। তারা রাজছত্র, চামর ও তাম্বুলকরংক ধারণ করত। রাজা যখন সিংহাসনে বসতেন ও শিবিকা বা রথে আরোহণ করতেন তখন তারা সংগে থাকতো।

(মৌর্যদের রাজপ্রাসাদে সশস্ত্র শরীররক্ষিণী থাকতো এবং প্রভাত-কালে ধনুর্ধারিণীরা রাজাকে অভিবাদন করতো। বারনারীদের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যসমূহ মৌর্যরাজ্যের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হ'ত।)

চাণক্য বলেছেন যে যুদ্ধকালে নারীরা পথ্য ও পানীয় নিয়ে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সেবাদলের অনুসরণ করবে। তাঁর অর্থশাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে রাষ্ট্রীয় শিক্ষকগণ বারনারী, ক্রীতদাসী ও নটীদের সংগীত, বীণা, বংশী, ঢাক প্রভৃতি বাদ্য, পরের মনের কথা অনুমান করার বিদ্যা, মাল্য, গন্ধ প্রভৃতির প্রস্তুতকৌশল, কেশবিন্যাস, আকর্ষণ, সম্মোহন প্রভৃতি শিক্ষা দেবে এবং এই সব মেয়েদের পুত্রগণকে গুপ্তচররূপে শিক্ষিত করা হবে। আরো বলা হয়েছে যে নট ও অনুরূপ ব্যবসায়ি-গণের পত্নীদের মধ্যে যারা বহুভাষায় ও ইংগিতদ্বারা সংবাদ প্রেরণের বিদ্যায় শিক্ষিত হয়েছে তারা তাদের আত্মীয়দের সংগে দোষীর নিরূপণে এবং বিদেশী চরের ছলনা ও হত্যায় নিযুক্ত হবে।

প্রাচীনকালে এইসব মেয়েদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল। রাষ্ট্র ও সমাজের এরা অ'রিহার্য অংগ ছিল, বহু ধন উপার্জন করতো এবং ইচ্ছাপূর্বক বিবাহদ্বারা অন্তঃপুরিকার জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে পারত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর নাটক মৃচ্ছকটিকে বারবনিতাদের ঐশ্বর্য, প্রতিষ্ঠা ও 'সাধারণবধূত্ব' পরিত্যাগ করে' 'গৃহবধূত্ব' গ্রহণের বিবরণ পাওয়া যায়।

কোনো কোনো রাষ্ট্রে এই নারীদের ব্যবসায়ের জন্য কর দিতে হ'ত। বিজয়নগর রাজ্যের ইতিহাসে এইরূপ ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।)

(অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবে ডুবোয়া লিখেছেন যে ভারতের মেয়েদের মধ্যে কেবলমাত্র বারবনিতারা লেখাপড়া ও নৃত্যগীত শিখতে পারতো।

এই সব শিক্ষা তাদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল বলে' অন্য নারীরা এইগুলিকে এত ঘৃণা করতো যে সতীনারীর পক্ষে এইসব বিদ্যার উল্লেখও অপমানকর বলে' গৃহীত হ'ত।

এইভাবে যুগোত্তরণের মধ্য দিয়ে ভারতের নারীর জন্য যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষের নয়, ভক্তি ও সতীত্বের। সংসারধর্ম ও কর্মনিপুণতার জন্যই ভারতনারীর প্রশংসা; পতিসেবা ও পতিপদানুসরণই তার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। গান্ধারীর সতীত্বখ্যাতি প্রধানত স্বামীর অন্ধতায় অন্ধতাবরণের জন্য, সীতার খ্যাতি পতির অনুসরণে, সতীর খ্যাতি স্বামিনিন্দায় দেহত্যাগে ও সাবিত্রীর খ্যাতি যমের কবলিত সত্যবানের আত্মার উদ্ধারে।

আদর্শ মহৎ হ'লেও এর মধ্যে ভারতের নারীর পতনের বীজও উপ্ত ছিল এবং ক্রমশ এদের দেবীত্ব নির্জলা দাসীত্বে পরিণত হয়।

বৌদ্ধগণের শিক্ষা

হিন্দুধর্মের দার্শনিক পরিণতি থেকে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও এই দুই ধর্মের মধ্যে গভীর প্রভেদ ছিল এবং এই প্রভেদগুলির দরুণ হিন্দু ও বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও পার্থক্য ছিল।

প্রথমত, বেদবিরোধী বৌদ্ধগণের শিক্ষা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা।

দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ স্বীকৃত হ'তনা বলে' সর্বজাতির লোকই শিক্ষকতা করতে পারতো।

তৃতীয়ত, শিক্ষার্থিগণের বিষয়েও বৌদ্ধশিক্ষায় জাতিভেদ ছিলনা। যদিও সংঘারামগুলি প্রধানত ধনী শ্রেষ্ঠী ও শক্তিশালী রাজগণের পৃষ্ঠ-পোষিত ছিল এবং তাদের সহায়তায় উন্নতি লাভ করেছিল, তবু ধনি-দরিদ্র ও জাতিনির্বিশেষে সকল ব্যক্তিরই তাতে প্রবেশের অধিকার ছিল।

চতুর্থত, নির্জনে বাস, ধ্যানধারণা, কর্মবিমুখতা ও আজীবন ব্রহ্মচর্য বৌদ্ধধর্মের আদর্শের অংগীভূত ছিল বলে এই আদর্শের মধ্য থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদলের উদ্ভব হয়েছিল। এরা আয মুনিঋষিদের মতো সংসারী ছিলোনা, সন্ন্যাসব্রত নিয়ে সংঘারাম ও বিহারে বাস করতো এবং এই সংঘারামগুলিই বৌদ্ধশিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়েছিল।

কুষ্ঠ, গুটিকা, যক্ষ্মা বা মৃগীরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, রাজকর্মচারী, বিঘোষিত দস্যু, কারাভংগকারী, দুষ্কর্মের চিহ্নযুক্ত ব্যক্তি, কশাঘাতভুক্ত পাপী, ঋণী, ক্রীতদাস, নপুংসক, বিকলাংগ বা অংগহীন ব্যক্তি প্রভৃতি ভিন্ন সকলেই সংঘারামে প্রবেশের অধিকারী ছিল।

বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ বিনয়পিটকে প্রাপ্ত সংঘারামের প্রবেশানুষ্ঠান থেকে জানা যায় যে এই ব্রতগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে চুলদাড়ি কামিয়ে হলুদরঙের উত্তরীয়ে এমনভাবে আবৃত হ'তে হ'ত যে একটি কাঁধ শুধু ঢাকা থাকতো। তারপর সে দীক্ষাদাতা গুরুর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে', আসন করে' বসে', যুক্তকর ঊর্ধে তুলে বলতো—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি"। সংঘপ্রবেশের এই প্রথম ধাপকে 'প্রব্রজ্যা' বলা হ'ত। আট বৎসর বয়সের আগে কোনো বালক এই ব্রত গ্রহণ করতে পারতোনা। ভিক্ষুত্বলাভের সম্পূর্ণতাপ্রাপ্তির অবস্থাকে 'উপসম্পদা' বলা হ'ত। কুড়ি বৎসর বয়সের আগে কেউ উপসম্পদা গ্রহণ করতে পারতোনা। বৌদ্ধ গুরু বা 'উপাধ্যায়' উপসম্পদা দান করতেন, কিন্তু তার পূর্বে বৌদ্ধশিষ্যকে সংঘারামের প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হয়ে প্রশ্নের উত্তর দ্বারা তার পরিতোষ সাধন করে' তার সম্মতিলাভ করতে হ'ত। উপসম্পদা লাভ করবার পর দশ বৎসর না কাটলে কোনো ভিক্ষু উপাধ্যায়ের পদ পেতে পারতোনা।

ভিক্ষুব্রতধারী মঠবাসীকে 'সদ্ধিবিহারিক' বলা হ'ত। প্রব্রজ্যাগ্রহণের প্রথম অবস্থায় তাকে 'শ্রমণ' বলা হ'ত। ধর্মান্তরিত বা অজ্ঞান শিক্ষার্থীকে মঠে আসবার পর চারমাসকাল পরীক্ষা করে' নেওয়া হ'ত। এই অবস্থাকে 'পরিবাস' বলা হ'ত।

মঠবাসিদের আচারব্যবহারের পরিচালনার জন্য দশটি শীল ছিল, এর মধ্যে পাঁচটি শীল বৌদ্ধমাত্রের পালনীয় ছিল আর ভিক্ষুগণ সম্পূর্ণ দশটিই পালন করত।

'প্রাণাতিপাত করিবেনা', 'অদত্তদ্রব্য গ্রহণ করিবেনা', 'অন্যায় (অব্রহ্মচর্য) করিবেনা', 'মিথ্যাকথা বলিবেনা', ও 'মত্ততাদায়ক পানীয়

গ্রহণ করিবে না',—এই পাঁচটি শীল বা নীতি সকল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মেনে চলতো। ভিক্ষুগণ এর সংগে আরো পাঁচটি মানতো; যথা, 'বিকালে ভোজন করিবেনা', 'নৃত্যগীতাদি করিবেনা', 'মাল্যচন্দনগন্ধাদির ব্যবহার করিবেনা', 'উচ্চ ও বিলাসপূর্ণ শয্যা গ্রহণ করিবেনা' ও 'স্বর্ণরৌপ্যাদি দান গ্রহণ করিবেনা'। ব্রহ্মচর্য ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের অবশ্যপালনীয় ছিল।

দশশীল ভিন্ন আরো বারোটি বিশেষ নিয়ম সদ্ধিবিহারিকের শিক্ষণীয় ও পালনীয় ছিল।

ভিক্ষুণীদের শিক্ষাব্যবস্থা সংঘারামের অধীন কিন্তু পৃথক ছিল। নবীনা ভিক্ষুণীদের 'শিক্ষমানা' বলা হ'ত। আট থেকে বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত এই অবস্থা থাকতো। সংঘারামের সমুদয় নিয়ম এদের পালনীয় ছিল এবং আরো বারোটি বিশেষ নিয়ম ছিল। একা ভ্রমণ করা, নদী পার হওয়া, পুরুষের অংগ স্পর্শ করা, পুরুষের সহিত এক গৃহে বাস করা, বিবাহে ঘটকতা করা ও কোনো গুরুতর পাপ গোপন করা ভিক্ষুণীদের নিষিদ্ধ ছিল।

'প্রতিমোক্ষ' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে ব্রতভংগজনিত সমুদয় অপরাধ ও শাস্তি বিবৃত আছে। প্রত্যেক সংঘারামে প্রতি মাসে দুইবার এই গ্রন্থ সাধারণ ভিক্ষুসভায় পঠিত হ'ত। সেই সময়ে পাপস্বীকৃতি ও দণ্ড-বিধানের ব্যবস্থা ছিল।

মঠের শৃংখলা-সম্পর্কিত নিয়মের মধ্যে গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রধান স্থান গ্রহণ করলেও ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার মতো গুরুর সম্পূর্ণ বশ্যতার কোনো নিয়ম ছিল না। অপরাধ ঘটলে অন্যূন দশজন ভিক্ষু মিলে দণ্ডবিধান করা হ'ত এবং গুরুতর অপরাধে মঠ থেকে বিতাড়ন পর্যন্ত করা যেত।

বৌদ্ধভিক্ষুর জীবিকার প্রধান উপায় ছিল ভিক্ষা। ভিক্ষুদের মধ্যে সাধনার অবস্থাভেদে স্তরবিভাগ ছিল। সর্বকনিষ্ঠ শ্রমণেরা সংঘারামের

নিম্নস্তরের কায়িক শ্রমের কাজগুলি করতো। উপাধ্যায় স্তরের ভিক্ষুগণ ধর্মশাস্ত্রের গবেষণা, ধর্মপ্রচার, গ্রন্থরচনা প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকতেন। দেশবিদেশে ভ্রমণ করে' ধর্মপ্রচার এঁদের কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল। বর্ষাকালে ভ্রমণের অসুবিধার জন্য এঁরা মঠে আশ্রয় গ্রহণ করতেন, তাকে 'বর্ষাবাস' বলা হ'ত। বর্ষাকালে ভিক্ষুণীগণও 'বাস' নামক বিশেষ ব্রত পালন করতো।

সংঘারামে প্রবেশের পর প্রত্যেক শ্রমণকে উপাধ্যায় বা আচার্য শ্রেণীর কোনো ভিক্ষুকে গুরুরূপে বরণ করতে হ'ত। দশবৎসরকাল এই গুরুর তত্ত্বাবধানে বাস করতে হ'ত। এই উপাধ্যায় শ্রমণের পিতৃস্থানীয় হ'তেন এবং উপাধ্যায়-শ্রমণের পারস্পরিক কর্তব্য ও সম্পর্কসম্বন্ধীয় বহু নিয়ম ছিল।

প্রত্যহ সকালে উঠে একটি কাঁধ অনাবৃত রেখে বস্ত্র সম্বৃত করে', জুতো খুলে, শ্রমণ উপাধ্যায়কে দাঁতন ও মুখ ধোবার জল দিত। তারপর তাঁর আসন ঠিক করে', পাত্র ধুয়ে, তাঁকে ভাতের মাড় দিত। খান করা হয়ে গেলে, মুখ ধোবার জল দিয়ে, পাত্র উপুড় করে' পরিষ্কার করে' ধুয়ে রেখে দিত। উপাধ্যায় উঠলে পর আসন সরিয়ে, স্থানটি অপরিষ্কার হয়ে থাকলে পরিষ্কার করতে হ'ত।

ভিক্ষার সময়ে শ্রমণকে উপাধ্যায়ের অনুসরণ করতে হ'ত এবং সে তাঁকে কোনো কাজে বাধা দিতে পারতো না।

উপাধ্যায়ের স্নানের সময়ে শ্রমণকে তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করে' তাঁ'র কাছে গিয়ে ধর্মালোচনার অনুরোধ বা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হ'ত।

শ্রমণকে উপাধ্যায়ের ভ্রমভ্রান্তির প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হ'ত এবং তিনি দোষ করলে তার সংশোধনের চেষ্টা করতে হ'ত।

উপরিউক্ত বিবরণ থেকে বোঝা যাবে যে গুরুর সংশোধনের দায়িত্ব ভিন্ন অন্য সমস্ত বিষয়ে শ্রমণ-উপাধ্যায়-সম্পর্কটি ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার গুরু-শিষ্য সম্পর্কের অনুসারী ছিল।

শ্রমণদের ধর্মাচরণে শিক্ষিত করা এবং সংঘারামে বাসকালে তাদের নিয়মাদি পালনের তত্ত্বাবধান করে' তাদের সংঘজীবনে অভ্যস্ত করা বৌদ্ধশিক্ষার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণে উপাধ্যায়ের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী ছিল এবং তাঁর স্থান ছিল অনেকটা ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার দীক্ষাগুরুর মতো।

বৌদ্ধশিক্ষার অপর উদ্দেশ্য ছিল অজ্ঞতার নিরসন। এর জন্য শ্রমণদের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন আচার্যের অধ্যাপনায় নানা বিষয়ের জ্ঞানলাভ করতে হ'ত। বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব এই শিক্ষার প্রধান অংশ ছিল। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব ও সাধনসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রচার, যথা জীবনের সংগে দুঃখের চিরসম্বন্ধ, কামনার উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় ইত্যাদি। এই আদর্শের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবর্তন বা প্রসারের সম্ভাবনা ছিল না।

আদর্শবাদের দিক থেকে লৌকিক জ্ঞানের আলোচনা বৌদ্ধশিক্ষার সমর্থিত না হ'লেও প্রাচীনতর বৌদ্ধশিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে অনেকগুলিতে নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

বৌদ্ধধর্ম তার পরিণতির সংগে মহাযান ও হীনযান এই দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। মহাযান বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাকেন্দ্রে উচ্চস্তরের বৌদ্ধিক পরিণতি ও শাস্ত্রালোচনার ব্যবস্থা ছিল আর হীনযানধর্মের শিক্ষা সাধারণ্যের অধিগম্য, লৌকিক ভাবাপন্ন ছিল। কোনো কোনো কেন্দ্রে ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার প্রভাবে ব্যাকরণাদিরও আলোচনা হ'ত।

বৌদ্ধপ্রভাবে ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছিল এবং

বিভিন্ন কেন্দ্রে এই বিদ্যার বিভিন্ন শাখা অনুসৃত হ'ত। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-ৎসাং উভয়েই চিকিৎসালয় ও ঔষধালয়ের উল্লেখ করছেন। চরক বৌদ্ধ সম্রাট কনিষ্কের সভাচিকিৎসক ছিলেন।

শারীরিক ব্যায়াম বৌদ্ধ সংঘারামের নিয়মের আবশ্যিক অংগ ছিল, কারণ আত্মিক উন্নতির জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন তারা স্বীকার করতো। আই-সিং বলেছেন যে ভিক্ষুগণ অবসরমতো, উপযোগী সময়ে, নির্বাচিত পথে পাদচারণা করতো, কারণ, এর দ্বারা ব্যাধির নিরাময় ও খাদ্যের পরিপাক হয়। প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে পাদচারণার সময় নির্দিষ্ট ছিল এবং বিশ্বাস ছিল যে শরীরের স্বাস্থ্য অটুট রাখলে আধ্যাত্মিক গুণের বৃদ্ধি হবে।

বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে গণিত ও আইনের কোনো উল্লেখ নেই।

নালন্দায় জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হ'ত এবং ভ্রান্তির অপনোদনের জন্য ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়নের প্রাধান্য দেওয়া হ'ত।

সংঘারামের বাহিরে জনশিক্ষার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু অনুমান করা যায় যে সংঘগুলির সহায়তায় ধর্মপ্রচারক্রমে জনশিক্ষার প্রভূত বিস্তার হয়েছিল। অনেক গ্রাম্য বালক নিকটবর্তী সংঘারামে গিয়ে ভিক্ষুদের নিকট সামান্য লেখাপড়া ও বৌদ্ধধর্মের নীতি শিক্ষা করতো। এ-ছাড়া বৌদ্ধভিক্ষুগণের পরিচালিত গ্রাম্যবিদ্যালয়েরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-প্রধান দেশ বর্মা ও সিংহলে প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ প্রচারের তুলনায় এই অনুমান দৃঢ় হয়।

বৌদ্ধ সংঘারামগুলিতে ভিক্ষু ভিন্ন সাধারণ বিদ্যার্থীও শিক্ষালাভ করতে পারতো। এদের 'ব্রহ্মচারী' বলা হ'ত।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করে' সাধারণ্যে প্রত্যাবর্তন করতে পারতো। কথিত আছে যে কবি ভর্তৃহরি সাতবার ভিক্ষুত্ব গ্রহণ ও পরিত্যাগ করেছিলেন।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য বৌদ্ধদের কোনো পৃথক ব্যবস্থা ছিল না, তারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থারই অনুবর্তন করে' এসেছিল।

বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ভিক্ষুগণ ভারতীয় বৌদ্ধদের শিক্ষা ব্যবস্থার যে বিবরণ দিয়ে গেছেন তার মধ্যে ফা-হিয়েন, হিউয়েন-ৎসাং ও আই-সিং এই তিন চৈনিক পরিব্রাজকের বিবৃতিই সর্বপ্রধান।

ফা-হিয়েন (খৃঃ ৩৯৯-৪১৪) বলেছেন যে ধ্যান, সূত্রের আবৃত্তি ও পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রধান কর্তব্য ছিল। তিনি পাটলিপুত্রের অশোকস্তম্ভের পাশে স্থাপিত একটি মহাযান ও একটি হীনযান সংঘারামের উল্লেখ করেছেন। এই দুটিতে মিলে ছয় সাতশত ভিক্ষু বাস করতো। চারিদিক থেকে শ্রমণ, ব্রহ্মচারী ও ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ সত্যের ভিত্তি ও মূল অনুসন্ধান করার জন্য এই স্থানে এসে আশ্রয় নিত। পঞ্জাবে মৌখিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে লিপির যথেচ্ছ ব্যবহার ছিল। কণ্ঠস্থ করা ও আবৃত্তি, শিক্ষার দুই অংগ ছিল।

হিউয়েন-ৎসাং (খৃঃ ৬২৯-৬৪৭) যে সময়ে ভারতে ভ্রমণ করেন সেই সময়ে এ-দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বহুল পুনঃপ্রচার ঘটা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। তখন মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও হীনযানের সংকোচন ঘটেছিল এবং বহু সংঘারাম নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। নালন্দা ভিন্ন অপর যে-কয়টি তখন প্রধান, ছিল তার মধ্যে গংগাতীরে হিরণ্যপর্বত নামক স্থানে দশটি সংঘারামে এক সহস্র ভিক্ষু বাস করতো। নালন্দার কিছু দূরে তিলদক নামে যে সংঘারাম ছিল

তার চারটি বিরাট কক্ষ, তিন স্তরের অলিন্দ, উচ্চ চূড়া ও সিংহদ্বারসমন্বিত প্রাচীর ছিল। এখানে সহস্র ভিক্ষু বাস ও শিক্ষালাভ করতো।

আই-সিং (খৃঃ ৬৭৩-৬৮৭) বৌদ্ধ শ্রমণগণের শিক্ষার বিবরণ দিয়েছেন। শ্রমণেরা রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে উপাধ্যায়ের কাছে যেত। তিনি তাদের আরামে উপবেশন করিয়ে ত্রিপিটকের থেকে সময়োপযোগী কোনো অধ্যায় নির্বাচন করে' পাঠ দিতেন। কোনো তত্ত্ব তিনি অমীমাংসিত রাখতেন না।

শ্রমণেরা উপাধ্যায়ের অংগমর্দন করতো, কাপড় গুছিয়ে রাখতো ঘরের সম্মুখস্থ প্রাংগন পরিষ্কার করতো, জলের মধ্যে কীট আছে কিনা দেখে উপাধ্যায়কে পান করতে দিত। শ্রমণ উপাধ্যায়ের জন্য সমুদয় কাজ ক'রে দিয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতো।

উপাধ্যায় শ্রমণের নৈতিক আচারের পরীক্ষা করে' অনুতাপ ও সংশোধনের ব্যবস্থা করতেন, অসুস্থতাকালে তার সেবা করতেন, ঔষধ জোগাতেন ও নিজ পুত্রের মতো যত্ন করতেন। 'বিনয়' আয়ত্ত করার পর পাঁচ বৎসর অতীত হ'লে পরে ভিক্ষু উপাধ্যায়ের থেকে পৃথক হওয়ার অধিকার পেত।

আই-সিং নালন্দার পাঠ ও পাঠ্যক্রমের বিবরণ দিয়েছেন এবং শিক্ষাশেষে পণ্ডিতসমাজের কার্যকলাপের সম্বন্ধে বলেছেন যে, প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ সুধিসভায় যোগ দিয়ে বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা করতেন। এই আলোচনায় তাঁরা নিজমতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আশ্বস্ত হতেন ও খ্যাতি অর্জন করতেন। এতদ্ভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত অথবা রাজদ্বারা পুরস্কৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং বিদ্যাবুদ্ধির তীক্ষ্নতার প্রমাণের জন্য তাঁরা রাজসভায় গিয়ে নিজ নিজ ক্ষমতার শাণিত অস্ত্র উপস্থাপিত

করতেন, নিজ নিজ পরিকল্পনাসমূহ উদ্‌ঘাটিত করতেন ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন। তারপর তাঁরা ভূমিদান পেতেন এবং উচ্চপদে স্থাপিত হতেন। সম্মানের চিহ্নস্বরূপ উচ্চ সিংহদ্বারে তাঁদের নাম ক্ষোদিত হ'ত। এই ভাবে যশ ও অর্থ অর্জন করে' শেষে তাঁরা স্বেচ্ছানুমোদিত কোনো কাজে ব্যাপৃত হতেন।

কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্রের কথা

প্রাচীন ভারতের তপোবন, পরিষদ রাজসভা বা রাজধানী তীর্থস্থান ও সংঘারামের মধ্য থেকে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র পরিণতি লাভ করেছিল। এর মধ্যে কোনোকোনটি স্বাভাবিকভাবে গড়ে' উঠেছিল আর কোনোকোনোটির পেছনে সচেষ্ট সংগঠন ছিল।

প্রাচীন যুগের আগ্যাংশে আর্যদের প্রথম উপনিবেশের সময় থেকে ঋষিগণ অরণ্যে যে তপোবন স্থাপন করতেন তার অনেকগুলিই ক্রমশ জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যাদানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কুটিরবাসী মুনিদের সেই তপোবনগুলির কোনো ধ্বংসাবশেষ বাকি না থাকলেও মহাকাব্যে, নাটকে, ইতিবৃত্তে, বাল্মীকি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কণ্ব প্রভৃতির তপোবন আজও লোকে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। কিঞ্চিদ্‌পরবর্তী নৈমিষারণ্য ও বদরিকাশ্রমের কথাও কেউ ভোলেনি।

নাগরিক সভ্যতা ও আর্যধর্মের ক্রমপরিণতির সংগে ক্রমশ জনপদ সমূহে পরিষদের উদ্ভব হয়। ধর্মশাসিত আর্য সাধারণ্যের পক্ষে পদেপদে শাস্ত্রবিধির নির্দেশের প্রয়োজন হ'ত। যে পণ্ডিতগণ বিধান দেবেন, শাস্ত্রসমূহের জটিলতাবৃদ্ধির সংগে ক্রমশ তাঁদের পক্ষে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ হওয়া কঠিন হয়ে উঠলো। মুখ্যত জনসমাজের ধর্মনির্দেশের এই প্রয়োজন থেকে আর্যদের জনপদগুলিতে পণ্ডিতমণ্ডলী বা পরিষদের প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। এই পরিষদের অংগীভূত পণ্ডিতগণ ধর্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয়ে ব্যবস্থা ও বিধান দিতেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে শ্বেতকেতুর পাঞ্চালের পরিষদের নিকট গমনের উল্লেখ আছে। মতভেদে এই পরিষদের গঠন বিভিন্ন প্রকারের হ'ত। গৌতম বলেন যে প্রত্যেক

পরিষদে দশজন সভ্য থাকবেন, চতুর্বেদের পণ্ডিত চারজন, প্রথম তিন আশ্রমের তিনজন ও ত্রিবিধ নীতির (সূত্রের) তিনজন। বশিষ্ঠ ও বোধায়নের মতে চতুর্বেদের চারজন, মীমাংসার একজন, অংগের একজন ও নীতিসূত্রের আবৃত্তিকারী একজন, এই সাতজন পরিষদের সভ্য থাকবেন। মনু বলেছেন যে শিষ্ট ব্রাহ্মণের উক্তিই নীতিস্বরূপ। যিনি সাংগ বেদাধিকারী ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণসমূহের দ্বারা শ্রুতির সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তিনিই শিষ্ট। এইরূপ তিন থেকে দশজন পর্যন্ত সভ্যসমন্বিত পরিষদের সভ্যদের দ্বারা নির্দেশিত নীতি অনস্বীকার্য। দশজনে গঠিত পরিষদে তিনজন বেদী, একজন নৈয়ায়িক, একজন মীমাংসক, একজন নিরুক্তবিদ্, একজন নীতির আবৃত্তিকারী ও তিন আশ্রমের তিনজন থাকবেন। ন্যূনপক্ষে তিনজন বেদী নিয়ে পরিষদ গঠিত হতে পারে।

এই ভাবে প্রথমত বিধান ও বিচারসভারূপে পরিষদের বিবর্তন হলেও ক্রমশ বহু জ্ঞানান্বেষী যুবক এর পণ্ডিতগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার ফলে বহু পরিষদ বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়।

রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে রাজধানীতে বা রাজসভায় শিক্ষা-কেন্দ্রের উদ্ভব হ'ত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের যে সকল রাজা গুণীর আদর করতেন তাঁদের সভাতে গুণিগণের সমাবেশ হ'ত এবং তাঁদের পশ্চাৎ বিদ্যার্থিসমাগমে ওই রাজধানীগুলি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হ'ত। উদাহরণস্বরূপ গান্ধারের রাজধানী তক্ষশীলা ও বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনীর নাম করা যায়।

অনুরূপভাবে তীর্থস্থানে পুণ্যকামী পণ্ডিতসমাগম ও তৎপশ্চাৎ বিদ্যার্থিসমাবেশের ফলে শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্ভব হয়, যথা—কাশী, নবদ্বীপ ইত্যাদি।

উপরিউক্ত কেন্দ্রগুলিকে স্বাভাবিক শিক্ষাকেন্দ্র (Centres of natural growth) বলে' অভিহিত করা যায় আর সংগঠিত শিক্ষাকেন্দ্রের (Organised centres) উদ্ভব হয় বৌদ্ধধর্মের পশ্চাৎ। বৌদ্ধভিক্ষুদের শিক্ষা ও সাধনার জন্য স্থাপিত সংঘারামগুলি কালে বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নিয়েছিল। একাদশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সময়ে শংকরাচার্য কতকগুলি মঠের স্থাপন করেছিলেন এবং তার কাছাকাছি সময়েই দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ মন্দিরসংশ্লিষ্ট বিদ্যাপীঠের উদ্ভব হয়। এইগুলি হিন্দুদের সংগঠিত শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে গণ্য।

তক্ষশীলাকে ভারতের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক শিক্ষাকেন্দ্র বলে' অভিহিত করা যায়। আধুনিক রাওলপিণ্ডির উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত তক্ষশীলা গান্ধাররাজ্যের রাজধানী ছিল। এর বারো বর্গমাইল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তিনটি নগরীর চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম বীরস্তূপ, এর কাল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব-১৫০০ থেকে খৃষ্ট পূর্ব ১৮০ পর্যন্ত, অর্থাৎ মৌর্যযুগের শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয় শ্রীকপ, সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রীক আক্রমণকারিদের দ্বারা স্থাপিত হয় এবং খৃষ্টীয় ৭০ পর্যন্ত গ্রীক, শক ও পার্থীয়গণের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তৃতীয় শ্রীসুখ, কুষাণ রাজগণের (কুষাণ সাম্রাজ্য-খৃষ্টপূর্ব ১৬৫ খৃষ্টীয় ১৭৬) দ্বারা স্থাপিত হয়।

আলেকজান্দারের আক্রমণের পর থেকে চার শতাব্দীর মধ্যে তক্ষশীলা মাসিদনীয়, মৌর্য, বাকৃট্রিয়; পার্থীয় ও কুষাণ এই পাঁচ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ও পাঁচটি সাংস্কৃতিক ধারায় অভিষিক্ত হয়।

রামায়ণে নীতির (আইন) শিক্ষাকেন্দ্ররূপে ও মহাভারতে সাধারণ ভাবে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগ্রন্থ ধম্মপদাত্থ কথায় তক্ষশীলায় 'সিপ্প' (শিল্প) শিক্ষার উল্লেখ আছে। মহাবগ্গে পাওয়া যায় যে বিম্বিসারের সভার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক তক্ষশীলায়

চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। এই শিক্ষায় তাঁর সাত বৎসরকাল লেগেছিল এবং পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সমস্ত উদ্ভিদের ঔষধমূল্যবিচার এই শিক্ষার অন্তর্গত ছিল। মহর্ষি আত্রেয় জীবকের গুরু ছিলেন। জাতকের বিবরণে জানা যায় যে এই স্থানে তিন বেদ, অষ্টাদশবিদ্যা ও বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ পড়ানো হ'ত তাছাড়া এখানে পশু চিকিৎসার গ্রন্থ হস্তীসূত্র পড়ানো হ'ত এবং 'নিধি-উদ্ধারণ' প্রভৃতি গুহ্যবিদ্যা ও মন্ত্র, অভিচারাদি শিক্ষা দেওয়া হ'ত। বিভিন্ন মাংগলিক অনুষ্ঠান আর আচারনীতিও শেখানো হ'ত। অপর উল্লেখে জানা যায় যে এইখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের ষোলোটি শাখা শেখানো হ'ত।

এখানে চিত্রাংকণ, ভাস্কর্য, প্রতিমাগঠন প্রভৃতি নানা হস্তশিল্পের বিদ্যালয় ছিল। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময়ে এখানকার শিল্পের ওপর গ্রীক প্রভাব পড়ে ও গ্রীকদের ওপর ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞানের প্রভাব পড়ে।

অশোকের সময়ে তক্ষশীলা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার বিরাট কেন্দ্র ছিল ও বহু রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠিপুত্র এখানে শিল্প, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করতো। ধনুর্বিদ্যার বিখ্যাত শিক্ষালয় থাকাতে এখানকার সামরিক বিদ্যালয়ে পড়বার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ক্ষত্রিয়দের সমাগম হ'ত। বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনির জন্ম স্থান গান্ধার ও শিক্ষাস্থান তক্ষশীলা ছিল।

এই শিক্ষাকেন্দ্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় ছিল না, বহু পণ্ডিতসমাবেশে স্বাভাবিক ভাবে এই কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। একেক গুরুর শিষ্যত্বে পাঁচ শত পর্যন্ত শিক্ষার্থী থাকতো এবং গুরুগণ অধিকতর অগ্রসর শিষ্যদের সহকারী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করে' তাদের সহায়তায় শিক্ষা দিতেন। গুরুর পুত্রও অনেক ক্ষেত্রে গুরুর স্থান নিত।

শিষ্যগণ সাধারণত গুরুগৃহে বসবাস করতো, গুরু কখন তাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা পৃথক আহারাদির ব্যবস্থা করতো আবার অনেক ক্ষেত্রে পুণ্যকামীর দাক্ষিণ্যের দ্বারাও দরিদ্র বিদ্যার্থিদের অন্ন জুটতো। অনেক সময়ে ধনিগৃহের সন্তান নিজের বাসস্থানে থেকে দৈনিক গুরুগৃহে পাঠের জন্য আসতো আবার গৃহিদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল।

বিদ্যাদানের বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট থাকতো। দিনে ও রাত্রিতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিষ্যের অধ্যাপনা হ'ত। প্রত্যেক উজ্জ্বল ও পবিত্র দিনে পড়ানো হ'ত।

এই স্থানে সমাজের সকল শ্রেণীর ও সকল অবস্থার বিদ্যার্থীর সমাগম হ'ত। রাজা ও ধনী শ্রেষ্ঠীর সন্তানগণের সংগে সামান্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্তানগণ সমানভাবে এক গণতান্ত্রিক অবস্থার অধীনে শিক্ষালাভ করতো। কেবল চণ্ডালদের এখানে শিক্ষা দেওয়া হ'ত না।

সাধারণত এখানে সহস্র কার্ষাপণ গুরুদক্ষিণা অগ্রিম দেওয়া হ'ত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বর্ণদক্ষিণা ও শিক্ষার পর দক্ষিণা দানেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু এই নির্দিষ্ট অর্থদান বাধ্যতামূলক ছিলনা। যারা অর্থমূল্য দিতে পারতোনা তারা শ্রমমূল্যে শিক্ষালাভ করতো। অর্থদানকারী শিষ্যদের শিক্ষা দিনে এবং শ্রমদানকারিদের শিক্ষা রাত্রিতে হ'ত।

অনেক সময়ে রাজপুরোহিতের পুত্র, রাজপুত্রের সহচর প্রভৃতি ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় বৃত্তি নিয়ে শিক্ষালাভ করতো।

এই আশ্রমগুলিতে সংযম ও সরলতার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত থাকায় ধনী ও দরিদ্র শিষ্যের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকতো না। জাতকের

বিবরণে জানা যায় যে দোষ করলে রাজপুত্রগণ সকলের সাথে সমান-ভাবে দণ্ডনীয় হ'ত ও কায়িক শাস্তি পর্যন্ত লাভ করতো। ধনি সন্তানের হাতে অধিক অর্থ পর্যন্ত থাকতো না। বারাণসীর রাজকুমার ব্রহ্মদত্ত একজোড়া পাদুকা, একটি ছত্র ও সহস্র কার্ষাপণমাত্র (গুরু-দক্ষিণা) সম্বল করে' তক্ষশীলায় গেছিল; কুমার জুন্হ এক ব্রাহ্মণের ভিক্ষাপাত্র ভেঙে ফেলেছিল কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ করার মতো অর্থ তার ছিল না।

তক্ষশীলা প্রাথমিক বা সাধারণ শিক্ষার কেন্দ্র ছিলনা। অন্যত্র শিক্ষালাভ করে' বয়ঃপ্রাপ্ত (অন্যূন ষোড়শ বৎসর বয়স্ক) বিদ্যার্থিগণ শিক্ষা সমাপ্ত করার জন্য এখানে আসতো। বিদ্যার্থিগণ তাদের স্বজাতীয় বা স্বধর্মীয় বিদ্যা অথবা তদ্ভিন্ন অন্যজাতির বিদ্যাও অর্জন করতে পারতো।

রাজগৃহ, বারাণসী, উজ্জয়িনী, কোশল, শিবি, কুরু, প্রভৃতি দূরদূর রাজ্য থেকে এবং উত্তর ও মধ্য ভারতীয় অঞ্চলসমূহ থেকে এখানে বিদ্যার্থীর সমাগম হ'ত। দূরবিস্তীর্ণ বহু মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে তক্ষশীলা যেন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ ছিল।

এখানকার পণ্ডিতদের যশ তক্ষশীলার প্রসিদ্ধির কারণ ছিল। তাঁদের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে' দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিদ্যার্থিগণ এসে গান্ধারের রাজধানী তক্ষশীলাকে সমগ্র ভারতের জ্ঞানরাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্যের বিখ্যাত রাজধানী উজ্জয়িনী প্রাচীন যুগের একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিক্রমাদিত্যের কালে এইস্থানে নবরত্নের সমাবেশ হয়। হর্ষচরিতরচয়িতা বাণ একে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পের কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করেছেন। জ্যোতির্বিদ্যার জন্যও এই

স্থান ভারতে খ্যাত হয়েছিল এবং বহুদিন হিন্দুরা এই স্থানকে কেন্দ্র (meridian) করে' দ্রাঘিমারেখা গণনা করতেন। হিউয়েন-ৎসাং বলেছেন যে সপ্তম শতাব্দীতে এখানকার সংঘারামে তিনশতাধিক ভিক্ষু বাস করতো।

বর্তমান অমরাবতীর নিকটে কৃষ্ণানদীতীরে বিদর্ভরাজ্যে অবস্থিত শ্রীধন্যকটক বা ধনকটক নাগার্জুনের সময়ে (আঃ খৃঃ ৩০০) বৌদ্ধ ও হিন্দু শিক্ষার কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। হিউয়েন-ৎসাং তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এর উল্লেখ করেছেন।

দ্রাবিড়দেশের রাজধানী, ধর্মপালের জন্মস্থান কাঞ্চীপুর দক্ষিণভারতের একটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।

মৈত্রক রাজগণের সময়ে (খৃঃ ৪৭৫-৭৭৫) তাঁদের রাজধানী বলভি পশ্চিম ভারতের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাত ছিল। হর্ষবর্দ্ধনের জামাতা রাজা ধ্রুবভট্টের ভাগিনেয় ডুড্ড্ বলভিতে একশত মঠের প্রতিষ্ঠাদ্বারা ছয় সহস্র ভিক্ষুর বাস ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্থিরমতি ও গুণমতি কিছুদিন এখানে অবস্থান করে' গ্রন্থরচনা করেছিলেন। হিউয়েন-ৎসাং বলভিকে হীনযান সম্পতীয় বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করেছেন।

ভারতের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যতার দিক দিয়ে তক্ষশীলার পর নালন্দা, কিন্তু খ্যাতিগৌরবে নালন্দা শ্রেষ্ঠতর কেননা এখানে শুধু ভারতের নয় ভারতের বাহিরের বহু স্থান থেকেও বিদ্যার্থিসমাগম হ'ত।

নালন্দা বিহারের বর্তমান রাজগিরের (রাজগৃহ) সাত মাইল উত্তরে বড়গাঁওয়ে অবস্থিত ছিল। কথিত আছে যে এই স্থানে লেপ নামক এক ধনিব্যক্তি বুদ্ধের আতিথ্য করেছিলেন এবং স্থানীয় বণিক্‌গণ

দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে এখানকার ভূমি ক্রয় করে' বুদ্ধদেবকে মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য দান করেছিলেন। নালন্দা সারিপুত্তের জন্মস্থান এবং অশোক নাকি তাঁর চৈত্যের নিকটে মন্দির স্থাপন করেছিলেন।

খৃষ্টাব্দের প্রথম থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও খৃষ্টীয় ৪২৫ থেকে ৬২৫কে এই বাস্তবিক অভ্যুদয়ের কাল হিসেবে অভিহিত করা যায়। রাজা শক্রাদিত্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃরূপে বিখ্যাত। তাঁর পর বুদ্ধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত ও বলাদিত্য এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। বলাদিত্যের কাল (পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ) এর উন্নতির শ্রেষ্ঠ সময়। তিনি এর কেন্দ্রীয় প্রধান মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমাবধি এই স্থানে ব্রাহ্মণ্যশিক্ষারও কেন্দ্র ছিল, এই কারণেই হয়তো ফা-হিয়েনের ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ নেই।

নালন্দা নামের দুই প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথমত, সংঘারামের নিকটবর্তী নাগানন্দ সরোবর থেকে এর নাম হয়ে থাকতে পারে এবং দ্বিতীয় এই স্থানে নাকি বুদ্ধদেব তাঁর এক বোধিসত্ত্ব জন্মে বহু দান দ্বারা 'ন-অলম্-দা' বা অবিশ্রান্তদাতা এই অর্থে 'নালন্দা' উপাধি লাভ করেন, এবং সেই নামানুসারে নালন্দার সংঘারামের নামকরণ হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি মঠ-মহাবিদ্যালয় ছিল। রাজা শক্রাদিত্য এর প্রথমটির প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর পুত্র বুদ্ধগুপ্ত আরেকটির করেন, তৎপুত্র তথাগতগুপ্ত আরেকটির, তৎপুত্র বলাদিত্য আরেকটির ও তৎপুত্র বজ্র পঞ্চমটির প্রতিষ্ঠা করেন। ষষ্ঠ মহাবিদ্যালয়টি অপর কোনো এক রাজার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, কেউ বলেন হর্ষ এবং কেউ বলেন কোনো গৌড়ীয় রাজা। এই ভাবে ছয় জন রাজার চেষ্টায় ছয়টি মহাবিদ্যালয়ের

প্রতিষ্ঠা হয়। এই সব রাজগণের প্রদত্ত শতগ্রামের আয় থেকে এর ব্যয় নির্বাহ হ'ত এবং পরে দুইশত গ্রাম এর সংশ্লিষ্ট হয়েছিল। এই সব গ্রাম থেকে মঠবাসীরা চাল, ননী ও দুধ পেত।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপনিবেশটির নাম ছিল ধর্মগঞ্জ ও সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি একটি ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীর গাত্রের প্রধান সিংহদ্বারটি কেন্দ্রীয় মহাবিদ্যালয়ের দিকে খুলতো। ওই মহাবিদ্যালয়টি আটটি বৃহৎ কক্ষদ্বারা বেষ্টিত ছিল। এর একটি উচ্চস্তম্ভ (tower) ও ক্ষুদ্রতর স্তম্ভসমূহ (turrets) ছিল। এখানে একটি মানমন্দির ছিল। নাগার্জুনের সময়ে সুবিষ্ণু নামক এক ব্রাহ্মণ মহাযান অভিধর্ম সাধনের জন্য এই স্থানে ১০৮টি মন্দির নির্মাণ করিয়ে দিয়ে ছিলেন। রত্নসাগর, রত্নরঞ্জক ও রত্নোদধি নামক তিনটি বিরাট প্রাসাদে ধর্মগঞ্জের গ্রন্থাগার রক্ষিত ছিল। রত্নোদধি সৌধটি নয়তলা উঁচু ছিল এবং সেখানে বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ রক্ষিত হ'ত। চৈনিক বৌদ্ধভিক্ষুগণ এই সব অট্টালিকার উজ্জ্বল বিবরণ লিখে গেছেন এবং প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই অপূর্ব সৌন্দর্যের সাক্ষ্য দেয়।

সংঘারামের প্রাংগনে নীলপদ্মশোভিত পুষ্করিণীসমূহ ছিল, সেখানে ভিক্ষুগণ স্নান করতো। প্রাংগনের পাশে উপাধ্যায় ও ভিক্ষুগণের বাসগৃহ ছিল। ভিক্ষুদের এই ছোট ছোট কুঠরি ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে। প্রত্যেক কুঠরিতে এক বা দুই জন ভিক্ষু থাকতো এবং তদনুসারে এক বা দুইটি পাথরের শয়নবেদী দেখা যায়। দেয়ালের গায়ে পুঁথি রাখবার জন্য একটি ও প্রদীপের জন্য একটি, এই দুইটি করে কুলুংগি দেখা যায়। কুঠরিগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর ছিল এবং ভিক্ষুত্বের ক্রমের শ্রেষ্ঠত্বানুযায়ী এইগুলি ভাগ করে দেওয়া হ'ত।

ভিক্ষু ও উপাধ্যায়ের আহারের ব্যবস্থা বিভিন্ন সত্রে করা হ'ত।

অনেক লোকের রান্নার উপযোগী বিরাট চুল্লীর ধ্বংসাবশেষ এখনও তার পরিচয় দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এখানকার অধিবাসিদের বাস ও আহারাদির সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন।

সপ্তম শতাব্দীতে যখন হিউয়েন-ৎসাং ও আই-সিং ভারতবর্ষে আসেন তখন নালন্দার গৌরব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগেও কমলমিশ্র তন্ত্রশিক্ষা দিচ্ছিলেন। সম্ভবত বিক্রমশীলার অভ্যুত্থানের সংগে এর প্রাধান্য কমে যায়।

আই-সিং (খৃঃ ৬৭৩-৬৮৭) বলেন যে এই কেন্দ্রে তিন সহস্রের অধিক ভিক্ষু বাস করতো এবং এর আটটি বৃহৎ কক্ষ ও তিনশত সাধারণ কক্ষ ছিল। তিনি একটি পদ্মক্ষোদিত প্রস্তরপথের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে মঠগুলির আসপাশে দশের অধিক পুষ্করিণী ছিল এবং প্রত্যহ প্রত্যুষে ভিক্ষুগণের স্নানের সময় ঘণ্টা বাজতো। 'চন্দ্রশ' নামক এক পুষ্করিণীর জল পান করলে নাকি ধীশক্তি বৃদ্ধি পেত। তিনি নালন্দার পাঠ ও পাঠ্যক্রমের একটি বিবরণ দিয়েছেন। এই বর্ণনায় দেখা যায় যে শ্রমণগণ প্রাতঃকালে নিজনিজ উপাধ্যায়ের সেবা সমাপ্ত করে' ধর্মশাস্ত্রের একাংশ পাঠ করে' পঠিত বিষয়ের চিন্তা করতো। এইভাবে তারা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নূতন জ্ঞান অর্জন ও পুরাতন বিষয়ের পুনরালোচনা করতো। আই সিং পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত পাঁচটি প্রধান বিদ্যার উল্লেখ করেছেন; যথা, শব্দবিদ্যা (ব্যাকরণ), শিল্পস্থানবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, হেতুবিদ্যা (তর্কশাস্ত্র) এবং অধ্যাত্মবিদ্যা। এরমধ্যে শব্দবিদ্যা ও ব্যাকরণের পাঠ অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর ছিল এবং উচ্চশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ বিদ্যার্থিরা ৫ বৎসর থেকে ২০ বৎসর পর্যন্ত এই বিদ্যা অর্জন করবার পর নালন্দায় প্রবেশের

পরীক্ষা দিতে পারতো। এ ভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যেরও একটি পাঠ্যক্রম আই-সিং দিয়েছেন।

হিউয়েন-ৎসাং (৬২৯-৬৪৫ খৃঃ) নালন্দার প্রাসাদ ও সরোবরসমূহের এক সুন্দর বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে গৌরব ও পাঠ্যবস্তুর মানের উচ্চতার দিক দিয়ে এই সংঘারাম ভারতে শ্রেষ্ঠ ছিল। এর ভাস্কর্যশিল্প অত্যদ্ভুত ছিল এবং ইঁটের গাঁথুনি এত চমৎকার ছিল যে তাদের জোড় বোঝা যেতনা।

এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বহু দান পেত বলে' শিষ্যগণ এত প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতো যে তাদের অন্ন, বস্ত্র, শয্যা ও চিকিৎসা এই চার বিষয়ের জন্য চিন্তা করতে হ'তনা। তিনি এখানে অবস্থানকালে প্রত্যহ ১২০টি জম্বীর, ২০টি সুপারি, ২০টি জায়ফল, আধ ছটাক কর্পূর ও দশ সের মহাশালী চাল পেতেন। তাঁকে প্রতিদিন প্রয়োজন মত ননী ইত্যাদি ও প্রতি মাসে তিন কাঠা তেল দেওয়া হ'ত।

নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিক্ষুগণ অধ্যয়নঅধ্যাপনা ভিন্ন বহু পুঁথির রচনা ও নকল করতো।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন ছিল। বিদেশাগত বিদ্যার্থিদের অধিকাংশই আলোচ্য সমস্যাগুলির কাঠিন্য বুঝতে পেরে পশ্চাদ্‌পদ হ'ত। কেবলমাত্র যারা অত্যন্ত গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী তারাই প্রবেশাধিকার লাভ করতো। প্রতি দশ জন বিদ্যার্থীর মধ্যে মাত্র দুই তিনজন প্রবেশ পরীক্ষায় উত্তর্ণ হ'তে পারতো। সংঘারামের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত 'পরীক্ষকপদে নিযুক্ত থাকতেন, তাঁকে দ্বারপণ্ডিত বলা হ'ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য তিনজন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নালন্দার যিনি প্রধান থাকতেন তিনি

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থনীতির রক্ষকস্বরূপ হতেন কিন্তু বয়ঃজ্যেষ্ঠতার দরুণ তিনি সাধারণত অতিবৃদ্ধ হতেন বলে' বিশ্ববিদ্যালযের প্রধান দায়িত্বভার বহন করতেন উপাধ্যক্ষ 'কর্মদান' ও প্রধান উপাসক 'স্থবির'।

কোরিয়া থেকে আগত পরিব্রাজক হ্যুই লুন বলেছেন, ধর্মগঞ্জের চতুর্দিক চতুষ্কোণ প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সৌধগুলি তিনতলা এবং প্রত্যেকটি তলা প্রায় বারোহাত উঁচু ছিল। কেন্দ্রীয় মহাকক্ষের পশ্চিমে অর্হণগণের চিহ্নের ওপর স্থাপিত কতকগুলি মূল্যবান, কারুকার্য খচিত স্তূপ ছিল। কালনির্ণয়ের জন্য একটি 'জলঘড়ি' ছিল; প্রতিদিন আটটি অংশে বিভক্ত হ'ত এবং ঢাক, শঙ্খ ও ঘণ্টার নিনাদে সময়ের নির্দেশ করা হ'ত। রাত্রি তিনটি যামে বিভক্ত ছিল। তার প্রথম ও তৃতীয় যামে ধর্মসাধন করা হ'ত, মধ্য যামে ভিক্ষুগণ বিশ্রাম নিতে পারতো।

এখানে ১৫০০ উপাধ্যায় ৮৫০৫ শ্রমণ ও ভিক্ষুককে উপদেশ দিতেন। দৈনিক একশত বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হ'ত এবং নিদ্রার সময়টুকু ভিন্ন নিরন্তর ধর্মালোচনা চলতো।

এখানকার শ্রেষ্ঠ উপাধি কুলপতি ও দ্বিতীয় উপাধি পণ্ডিত। সংঘারামর দুই জন শ্রেষ্ঠ কর্মাধ্যক্ষ ভিন্ন কেউ পেতে পারতেন না। অপর পক্ষে এর শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ছিল। পাক্ষিক প্রতিমোক্ষ পাঠের দিন সাধারণ সভায়. সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যেক বিষয়ের বিচার করা হ'ত।

সংঘারাম ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি। বিভিন্ন শ্রেণীর ও দলের বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে পরস্পরের সংগে মিলেমিশে বাস করতো। উদারতাই এখানকার ধর্মালোচনার প্রধান ভিত্তি ছিল। ভিক্ষুগণ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারতো, কিন্তু সাধারণ পাঠ্যক্রমের প্রধান বিষয়গুলি বাধ্যতামূলক ছিল।

চীন. তিব্বত. কোরিয়া, মধ্য এসিয়া, বোখারা প্রভৃতি দূর দূর দেশ থেকে ভিক্ষুগণ এখানে অধ্যয়ন করতে আসতো. আবার এখানকার শ্রেষ্ঠ উপাধ্যায়গণ ধর্ম প্রচারের জন্য দূর দূর দেশে যেতেন।

এখানকার উপাধ্যায়গণের মধ্যে অনেকেই খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন। বিখ্যাত দার্শনিক শরহ নাগার্জুনের গুরু ছিলেন। নাগার্জুন (খৃঃ ৩০০) নালন্দা বিহারের স্থাপয়িতৃগণের অন্যতম ও মাধ্যমিক-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর শিষ্য আর্যদেব তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন, বহু দেশ ভ্রমণ করেন ও আলোচনায় বহু তীর্থিককে পরাজিত করেন। আর্য আসংগ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধু বিখ্যাত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার ছিলেন। বসুবন্ধুর (খৃঃ ৪০০) শিষ্য দিঙনাগ তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন ও বহু তীর্থিককে পরাজিত করেন। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'দিঙ্‌নাগানাং স্থূলহস্তাবলেপ' দ্বারা সম্ভবত এঁর প্রতি তির্যকোক্তি করেছিলেন। ধর্মপাল কিছুদিন নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁর শিষ্য, সমতটবাসী শীলভদ্র শ্রেষ্ঠতম অধ্যক্ষদের মধ্যে একজন বলে' খ্যাত। বরেন্দ্রবাসী স্থিরমতি এখানকার উপাধ্যায় ছিলেন। তাঁর শিষ্য চন্দ্রগোমিন্‌ বহু শাস্ত্রগ্রন্থের প্রণয়ন করে। উপাধ্যায় শান্তরক্ষিত তিব্বতে গিয়ে সেস্থানের প্রথম বৌদ্ধ মঠ স্থাপনের সহায়তা করেন। উপাধ্যায় কমলশীল কিছুকাল তিব্বতে বাস করেছিলেন। প্রভাকরমিত্র খৃঃ ৬২৭) চীনদেশে ও জীনমিত্র তিব্বতে গিয়েছিলেন।

এই ভাবে ভিক্ষুর আদান প্রদানের ফলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা এক আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তখন নিকট প্রাচ্যে সারাসেনীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হয়নি ও য়ুরোপ মধ্যযুগীয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল।

নালন্দার গৌরব অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে কিছু ম্লান হলেও তার

অস্তিত্ব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ছিল। দশম থেকে একাদশ শতাব্দীতে নালন্দায় অনূদিত পুঁথি এখনও বর্তমান আছে। একাদশ শতাব্দীতে শ্রীজ্ঞান কিছুদিন এর অধ্যক্ষপদ ভূষিত করেছিলেন।

প্রধানত ভিক্ষুদের শিক্ষাকেন্দ্র বলে শিল্পশিক্ষা প্রাধান্য না পেলেও 'শিল্পস্থানবিদ্যা' এখানের পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছিল এবং এখানকার মঠ-মন্দির-চৈত্য-প্রাসাদের শিল্পগৌরব দ্রষ্টামাত্রকেই মুগ্ধ করতো। নালন্দার প্রধান শিল্পী ধীমান ও তৎপুত্র বিট্‌পালক (বিট্‌পালো) এক বিশিষ্ট শিল্পধারার প্রবর্তন করেছিলেন। এঁরা বাঙালী ছিলেন বলে' কেউ কেউ অনুমান করেন।

নালন্দার পরই যার বিদ্যাগৌরব, সেই নালন্দার উত্তরাধিকারী ও প্রতিস্পর্ধী কেন্দ্র হ'ল বিক্রমশীলা। এই সংঘারাম বিহারের গংগাতীরে কোনো এক পাহাড়ের উপর স্থাপিত ছিল বলে বিদিত আছে কিন্তু এর বাস্তবিক অবস্থান আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কারো কারো মতে বিক্রমশীলা ভাগলপুরের নিকট অবস্থিত ছিল আর কেউ কেউ বলেন যে তার অবস্থান নালন্দার অতি সন্নিকটে ছিল। নালন্দা ও বিক্রম-শীলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা চিন্তা করলে দ্বিতীয় অনুমানকেই বেশি সম্ভবপর বলে' মনে হয়। কথিত আছে যে বিক্রমনামক এক যক্ষের নামে এই সংঘারামের নামকরণ হয়।

পালবংশীয় রাজা গোপালের পুত্র রাজা ধর্মপাল এর প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের চারটি শাখানুযায়ী চারটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করে' আচার, ব্যাকরণ, গুহ্যতত্ত্বাদির অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক শাখার মঠে সেই শাখার বৌদ্ধধর্মের বিশেষজ্ঞ সাতাশজন উপাধ্যায়ের হিসাবে সর্ব সমেত এক শত আট জন (২৭ × ৪) উপাধ্যায় ছিলেন। এ ছাড়া বিভিন্ন কর্মবিভাগেরও আচার্য ছিলেন।

পরে, বর্ধিতাকারে, এখানে ছয়টি মহাবিদ্যালয় ও একটি কেন্দ্রীয় মহাকক্ষ ছিল। কেন্দ্রীয় মহাকক্ষটি বিজ্ঞানের কক্ষ বলে' অভিহিত ছিল ও সেখানে প্রজ্ঞাপারমিতার অধ্যাপনা হ'ত। চারটি সত্রে ভিক্ষুগণের বিনামূল্যে আহারের ব্যবস্থা হ'ত। সংঘারামের কেন্দ্রস্থলে একটি মহাবোধিমন্দির ও প্রাংগনের মধ্যে ৫৪টি বৃহৎ ও ৫৪টি ক্ষুদ্র মন্দির ছিল। তিব্বতীয় ভিক্ষুগণের জন্য একটি পৃথক গৃহ নির্দিষ্ট ছিল। এর দ্বারা তিব্বতের সংগে বিক্রমশীলার বিশেষ সম্পর্ক বোঝা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়টির চারদিক প্রাচীরবেষ্টিত ছিল এবং ছয়টি মঠের ছয়টি প্রবেশদ্বার ছিল—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, এই চারদিকে চারটি এবং প্রথম ও দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় সিংহদ্বার নিয়ে ছয়টি। প্রথম কেন্দ্রীয় দ্বারের দক্ষিণে নাগার্জুনের ও বামে অতীশের চিত্র অংকিত ছিল।

দ্বারগুলি বন্ধ হয়ে যাবার পর যে-সব অতিথি আসতো তাদের জন্য প্রাচীরের বাহিরে, সিংহদ্বারের পাশে ধর্মশালা ছিল।

সংঘারামের পরিচালনার জন্য ছয়জন সভ্যসংবলিত একটি সংসদ ছিল, সংঘের প্রধান ভিক্ষু তার প্রধান স্থান গ্রহণ করতেন।

কথিত আছে যে কিছুকালের জন্য নালন্দা ও বিক্রমশীলা এক পরিচালকসংঘের অধীন ছিল এবং কয়েকজন উপাধ্যায় উভয় স্থানেই অধ্যাপনা করেছেন। এই ভাবে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

ছয়টি মঠের প্রবেশদ্বারের কাছে ছয়জন দ্বারপণ্ডিত বসতেন, তাঁরা প্রবেশপ্রার্থিদের পরীক্ষা করে' নিতেন। সম্ভবত প্রত্যেক মঠের অধ্যক্ষই এই পদ গ্রহণ করতেন। যে দুজন পণ্ডিত ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপনা করতেন তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তম্ভ বলে' অভিহিত করা হ'ত।

এখানে পাঠ সমাপ্ত হ'লে বিদ্যার্থিগণ 'পণ্ডিত' উপাধি পেত,

নালন্দার মতো এখানকার উপাধি কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠতমদের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো না। মগধের রাজগণ উপাধি পত্র দান করতেন এবং পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠতম হতেন তাঁদের চিত্র প্রাচীর গাত্রে অংকিত থাকতো।

এখানকার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন রাজা ধর্মপালের রাজপুরোহিত আচার্য বুদ্ধ জ্ঞানপাদ। তিনি বিক্রমশীলাকে কেন্দ্র করে' বৌদ্ধধর্মের এক নোতুন শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। নালন্দার পদ্মসম্ভবের শিষ্য, মহাচার্য ও মহাপণ্ডিত উপাধিধারী বৈরোচনরক্ষিত বিক্রমশীলায় অধ্যাপনাকালে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন ও আনুমানিক ৭৫০ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে যান। আচার্য জেতারি রাজা মহীপালের সময়ে (খৃঃ ৮৯৯-৯৪০) বিক্রমশীলা থেকে পণ্ডিত উপাধি লাভ ক'রে উপাধ্যায় হয়েছিলেন। ইনি অতীশের আচার্য ছিলেন।

দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, চনকের রাজত্বকালে (৯৫৫-৯৮৩ খৃঃ) এই স্থানে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সমাবেশ হয়েছিল। কাশ্মীরাগত রত্নবজ্র বিক্রমশীলায় 'পণ্ডিত' উপাধি লাভ করে' ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও তিব্বতে ভ্রমণ করেন। গৌড়ীয় মহাপণ্ডিত জ্ঞানশ্রীমিত্র (খৃঃ ৯৮৩) দ্বারপণ্ডিতের পদ লাভ করেছিলেন ও তিব্বতে গিয়ে ধর্ম-প্রচার ও তিব্বতীয় ভাষার বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ করেছিলেন। মহাচার্য রত্নাকর শান্তি ওদন্তপুরী থেকে এসে জেতারির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পূর্বদ্বারের দ্বার পণ্ডিতের পদ পেয়েছিলেন এবং তিব্বত ও সিংহলে ধর্ম প্রচার করেন।

বিক্রমশীলার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন দীপংকর শ্রীজ্ঞান, যাঁর অপর নাম উপাধ্যায় অতীশ। ৯৮০ খৃষ্টাব্দে, গৌড়ের রাজপরিবারে এঁর জন্ম হয়। অল্প বয়সে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে' কৃষ্ণগিরি ও ওদন্তপুরীতে শিক্ষালাভ করার পর তিনি সুবর্ণদ্বীপ (পেগু) ও সিংহলে ভ্রমণ করে'

এখানে আসেন। এখানে তিনি প্রথমে এক দ্বারের দ্বারপণ্ডিতের পদ লাভ করেন ও পরে রাজা ন্যায়পাল তাঁকে বিক্রমশীলার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি গৌড় ও মগধের বৌদ্ধসভার শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুরূপে নির্বাচিত হন। বৃদ্ধ বয়সে তিব্বতের রাজার অনুরোধে তিনি সেখানকার বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করতে যান ও তেরো বৎসর (১০৪০-৫৩ খৃঃ) সেখানকার সংঘের নেতৃত্ব করার পর ৭৩ বৎসর বয়সে লাসায় মারা যান। তিনি বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ নেতৃরূপে গণ্য ছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দী অবধি বিক্রমশীলায় তিন সহস্র ভিক্ষুর বাস ছিল বলে' শোনা যায়। সম্ভবত ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলিজির আক্রমণে এই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

বিক্রমশীলার সমসাময়িক অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে জগদ্দল, ওদন্তপুরী, কান্যকুব্জ, কনিষ্কমহাবিহার, শাক্য ও কাশ্মীর প্রভৃতির নাম করা যায়।

কান্যকুব্জ হর্ষবর্ধনের সময় পর্যন্ত বৌদ্ধশিক্ষার কেন্দ্র ছিল; হর্ষের সাম্রাজ্যের পতনের পর হিন্দুশিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। রাজা যশোবর্মণের রাজত্বকাল (খৃঃ ৬৭৫-৭১০) থেকে এই স্থান পূর্বমীমাংসার আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজা লক্ষ্মণ সেনের দ্বারা এই স্থান থেকে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের আনয়নের কথা থেকে এই স্থানের প্রাধান্য অনুমান করা যায়।

কাশ্মীরের রাজগণ বহু প্রাচীন কাল থেকে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। শ্রীনগরের নিকটবর্তী জয়চন্দ্র মঠের গ্রন্থাগার বিখ্যাত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন-ৎসাং এই স্থানে এসে দুই বৎসর ছিলেন। তিনি লিখে গেছেন যে এখানে এক শত মঠে এক হাজার ভিক্ষু বাস করতো। ওদন্তপুরী বা উদ্দণ্ডপুরম পাটলিপুত্রের নিকটে অবস্থিত

ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পালবংশের প্রথম রাজা গোপাল এখানকার সংঘারামের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে এক সহস্র ভিক্ষুর বাস ছিল এবং বাঙালী পণ্ডিত প্রভাকর এখানকার বিখ্যাত উপাধ্যায় ছিলেন। এটি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল ও ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্মের বহু গ্রন্থসমন্বিত অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার এর গৌরবের স্থল ছিল। ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলিজি এখানের ভিক্ষুগণকে নিঃশেষে হত্যা করেন।

পুরুষপুর বা পেশোয়ারের নিকটবর্তী কনিষ্ক মহাবিহার নবম শতাব্দীর পণ্ডিত বীরদেবের নামের সংগে জড়িত ছিল।

বংগ ও মগধের রাজা রামপাল (খৃঃ ১০৮৪-১১৩০) গংগা ও করতোয়া নদীর মধ্যে রামাবতী বলে' নগর স্থাপন করে' সেখানে জগদ্দল বিহারের প্রতিষ্ঠা করেন। বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, শুভকর, মোক্ষকর গুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এখানে অধ্যাপনা করতেন এবং এর সংগে তিব্বতের যোগাযোগ ছিল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দের মুসলমান আক্রমণের সংগে এই মঠের ধ্বংস হয়।

প্রাচীন ভারতের এক প্রধান তীর্থক্ষেত্র কাশী বা বারাণসী পুরাণেতিহাসের কাহিনীর সংগে এমনভাবে জড়িত যে এর বাস্তবিক তথ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই তীর্থস্থান এক স্বাভাবিক ভাবে বিবর্তিত শিক্ষাকেন্দ্ররূপে খ্যাত।

ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে এর উল্লেখ আছে। বেদব্যাসের সময়ে কাশী তীর্থস্থান ছিল। কথিত আছে বারাণসীতে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী রচনা করেন এবং কপিলের সাংখ্যদর্শন, যাস্কের নিরুক্ত ও গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র এখানে রচিত হয়েছিল।

বুদ্ধদেব এখানে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। জাতকে বারবার এর উল্লেখ

করা হয়েছে। বৌদ্ধযুগে সম্ভবত কাশীর পণ্ডিতগণ তক্ষশীলা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখে এসে কাশীকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

শংকরাচার্য কিছুকাল এখানে অধ্যয়ন করেন। তাঁর বেদান্তসূত্র এখানে রচিত হয়েছিল হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সময় থেকে কাশী হিন্দুধর্মের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

একাদশ শতাব্দীতে আলবেরুণি এর মাহাত্ম্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে আইন-ই-আকবরীতে এর নাম করা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ণিয়র লিখেছেন যে কোন মহাবিদ্যালয় বা নির্দিষ্ট অধ্যয়নকক্ষ না থাকলেও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

পণ্ডিতগণের গৃহে গৃহে পরিব্যাপ্ত এই বিদ্যাপীঠগুলি প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির স্মারকস্বরূপ বৃটিশ যুগেও বর্তমান ছিল। কোন গুরুর কাছে হয়তো পাঁচ ছয়টি শিষ্য পড়তো আর কারো কাছে বা ১২।১৫টি। বর্ণিয়র তদূর্ধ শিষ্যসংখ্যার উল্লেখ করেননি, কিন্তু জাতকে একেক গুরুর পাঁচ শত পর্যন্ত শিষ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়।

মধ্য যুগের দ্বিতীয় অংশ থেকে বারাণসী সংগীতচর্চার কেন্দ্ররূপেও পরিণতি লাভ করেছিল।

মুসলমান রাজত্বকালে স্থাপিত হিন্দুশিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজ্য কিছুদিন হিন্দু পণ্ডিতগণের আশ্রয়স্থলরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল।

হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের পর ধর্মপ্রচারকগণের শিক্ষার জন্য শংকরাচার্য ভারতের বহুস্থলে মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। তার মধ্যে শৃংগেরি, বদরি, দ্বারকা ও পুরী এই চার স্থানের চারটি মঠ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, বেদান্ত ও ন্যায়শাস্ত্রের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে

মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত শৃংগেরির মঠ সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছিল আর চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মের প্রভাবে পুরীর যশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মিথিলার ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব থাকা সত্ত্বেও তাকেও মধ্যযুগীয় শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে গণ্য করা যায়। রাজর্ষি জনক কুরুপাঞ্চালের পণ্ডিতবর্গকে মাঝে মাঝে তাঁর সভায় আলোচনার জন্য আহ্বান করতেন বলে জানা যায় এবং বৌদ্ধগ্রন্থসমূহেও মিথিলার উল্লেখ আছে, কিন্তু মধ্যযুগের মিথিলার অভ্যুত্থান বংগের সেনরাজগণের সময় থেকে (১১১৯-১২০০)। কামেশ্বর বংশের রাজত্বকালেও (খৃঃ দ্বাদশ-পঞ্চদশ শতাব্দী এর গৌরব বর্তমান ছিল। পরে নবদ্বীপের বৃদ্ধির সংগে এর প্রাধান্যের হানি ঘটে। মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি বৈষ্ণবকাব্যে আধিপত্য করেছিলেন আর মহাপণ্ডিত গংগেশ তত্ত্বচিন্তামণি রচনা করে’ ‘নবন্যায়ের’ সূত্রপাত করেন। গংগেশের পুত্র বর্ধমান আর পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র (খৃঃ ১২৭৫) এই বিষয়ে গ্রন্থ ও টীকা রচনা করেন। পক্ষধর একপক্ষকাল ব্যাপী আলোচনা সভায় জয়লাভ করে’ পক্ষধর উপাধি লাভ করেন। তাছাড়া বাচস্পতি মিশ্র, বাসুদেব মিশ্র, বর্তমান দ্বারভাংগার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহেশ ঠাকুর প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত মিথিলায় ছিলেন। এখানকার শেষ পরীক্ষার নাম ছিল শলাকাপরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য দেশবিদেশে থেকে বিদ্যার্থিগণ মিথিলায় পড়তে আসতো।

বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাকেন্দ্র নদীয়া বা নবদ্বীপের অভ্যুত্থান হয় মিথিলার পর। ভাগীরথী ও জলাংগীর সংগমস্থলের এই নগর যুক্ত-প্রদেশের সংগে জলপথে বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র ছিল তারপর ১০৬৩ বা ১১০৬ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মণ সেন একে গৌড়ের রাজধানী করায়, নদীয়া শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিণিত পায়। লক্ষ্মণ সেনের প্রধানমন্ত্রী হলায়ুধ ব্রাহ্মণ

সর্বস্ব, স্মৃতিসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব ও ন্যায়সর্বস্বের রচয়িতা মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভিন্ন জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি প্রভৃতি কবি, স্মৃতি-বিবেকের রচয়িতা শূলপাণি এবং আরো বহু মহাপণ্ডিত এই রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন।

১১৯৭ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলিজির ভয়ে রাজা লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করে' পূর্ববংগের বিক্রমপুরে নিজ রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু মুসলমান রাজত্বকালেও ১১৯৮ থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নদীয়া নিজ গৌরব বজায় রাখতে পেরেছিল।

কথিত আছে যে অদ্ধিবোধ যোগী নামক পণ্ডিত এইস্থানে ন্যায়ের অধ্যাপনা করতেন। সেই সময়ে মিথিলা নবন্যায়ের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং সেখানকার পণ্ডিতগণ কোনো শিষ্যকে কোনো পুঁথি বা টীকা নিয়ে যেতে দিতেন না বলে' অন্য কোনো স্থানে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা উৎকর্ষ লাভ করতে পারতো না। মিথিলার এই গৌরব ভাংতে আরম্ভ করেন প্রথমে নবদ্বীপের বাসুদেব সার্বভৌম (১৪৫৮-১৫২৫ খৃঃ)। তিনি মিথিলার শলাকাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সার্বভৌম উপাধি পান এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনেকাংশ কণ্ঠস্থ করে' নদীয়ায় এসে নবন্যায়ের কেন্দ্র স্থাপন করলেন। তাঁর শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি "পক্ষধরের পক্ষ শাতন করে"—নদীয়াকে নবন্যায়ের উপাধিদানের কেন্দ্রে পরিণত করলেন। তিনি গৌতমসূত্রের টীকা ও নবন্যায়ের গ্রন্থ দিধীতি রচনা করেন।

রঘুনাথ স্মার্ত ভট্টাচার্য এখানে প্রসিদ্ধ নীতির অধ্যাপক ছিলেন ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রদর্শনের গ্রন্থ রচনা করে' বিখ্যাত হয়েছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন মিশ্র স্মৃতির এবং ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে রামরুদ্র বিদ্যানিধি জ্যোতিষের অধ্যাপনার জন্য টোল খোলেন।

এইভাবে নবদ্বীপ ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, তন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু এর মুকুটমনি ছিলেন বংগদেশের ভক্তিধর্মের প্রবর্তয়িতা শ্রীচৈতন্যদেব।

এখানে শিক্ষা দেওয়া হ'ত পাতার কুটিরে, পণ্ডিতগণের ঘরে ঘরে এবং শিক্ষার ব্যবস্থা বহুলভাবে আবাসিক ছিল। শিক্ষ হ'ত তর্ক, আলোচনা এবং গ্রন্থাদি কণ্ঠস্থ করার দ্বারা।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে' দক্ষিণ ভারতে মন্দির সংশ্লিষ্ট বহু সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ পরিণতি লাভ করে; হিন্দুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্ররূপে এগুলি লক্ষ্যণীয়। এগুলির মধ্যে দক্ষিণ আর্কটের এন্নায়িরমের বৈদিক বিদ্যাপীঠ সর্বপ্রধান ছিল। এই বিদ্যাপীঠ রাজেন্দ্রচোল দেবের সময়ে (১০১৮-১০৩৫ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে বেদ, বেদান্ত, ব্যাকরণ, মীমাংসা প্রভৃতি পড়ানো হ'ত। এর সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসগুলিতে ৩৪০ শিষ্য বাস করতো। বিনামূল্যে এদের আহার, বাস ও শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ত। বিদ্যার্থিদের উৎসাহের জন্য দৈনিক যথেষ্ট পরিমাণে চাল ও বৎসরে দুই ভরি পরিমাণের সোনা দেওয়া হ'ত। অধ্যাপকেরাও তণ্ডুল ও স্বর্ণমানে বেতন পেতেন। বিদ্যাপীঠের ব্যয়নির্বাহার্থে ৪৫ ভেলি (প্রায় ৩০০ একর) ভূমি ছিল এবং স্থানীয় পরিষদও নির্দিষ্ট অর্থ সাহায্য করতো।

আর্যজীবন ও শিক্ষাদর্শের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক জাতিরই বিশিষ্ট আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও শিক্ষা-পদ্ধতি থাকে। আর্যপরিবার য়ুরেশিয়াব্যাপী এক বিরাট জাতিসমুচ্চয় হ'লেও ভৌগোলিক পরিবেশের ভিন্নতা ভারতীয় ও অন্যান্য আর্যগণের মধ্যে চারিত্রিক পার্থক্যের সৃষ্টি করেছিল এবং সেই পার্থক্য সাংস্কৃতিক বিকাশের সর্বাংশে আত্মপ্রকাশ করেছিল। উপরন্তু প্রাকৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও সুরক্ষিত হওয়ার ফলে ভারতের বৈশিষ্ট্যগুলি অনন্যসাধারণ গভীরতা ও স্থায়িত্ব লাভ করেছিল।

য়ুরোপের দীর্ঘ, তীব্র শীত, অনুর্বর ভূমি ও বিভিন্ন অঞ্চলের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি প্রাধান্যলাভ করেছে এবং য়ুরোপীয়েরা অপেক্ষাকৃত কার্যক্ষম, উদ্যোগী ও প্রভুত্বশীল হয়েছে। প্রতিকুল প্রাকৃতিক অবস্থায় য়ুরোপের দক্ষিণ ভিন্ন সর্বত্র সভ্যতার পরিণতি অনেক দেরিতে হ'লেও তাদের উদ্যোগিতা শিল্প, বিজ্ঞান ও অর্থ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মানুষের সুখ-সুবিধার জন্য নিয়োজিত করতে প্রবৃত্ত করেছে এবং জনসাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর হয়েছে।

অপরপক্ষে ভারতের অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার জন্য এদেশের লোকেরা দার্শনিকভাবাপন্ন ও কর্মবিমুখ হয়েছে; জ্ঞানবিজ্ঞান, ঐশ্বর্যাদির উদ্ভব হ'লেও জীবনসংগ্রামের তীব্রতার অভাবে সামাজিক সংঘর্ষ আত্ম-প্রকাশ করেনি; সমাজের শীর্ষে চিন্তাশীল জাতিরূপে ব্রাহ্মণের উদ্ভব হয়েছে এবং সমস্ত জাতি স্তরবিন্যস্ত সমাজের ঐতিহ্যশাসন মেনে নিয়েছে।

আর্যদের জীবন ও শিক্ষা ধর্মসূত্রে গ্রথিত ছিল। এই ধর্ম ইংরেজি 'রিলিজিয়ন' নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক বিষয়সমূহ নিয়ে এক অখণ্ড সমন্বয়। এর মধ্যে কেবল জীবন নয়, জীবনমরণকে একসূত্রে গ্রথিত করে অনন্ত জীবনযাত্রার কল্পনা করা হয়েছে। উপনিষদের ভাষায় এই জীবনকে ঊর্ধমূল পিপ্পলবৃক্ষের সংগে তুলনা করা যায়, মূল যার অনন্তে নিবদ্ধ এবং "গুণপ্রবৃদ্ধবিষয়প্রবালাঃ" ইহজীবনে শাখায়িত।

ধর্মপ্রতিষ্ঠিত এই আর্যদের সমাজ কতকগুলি নিয়মে আবদ্ধ ছিল। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জাতিভেদ প্রথা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে ভগবানের বিভিন্ন অংশজাত এবং যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের অধিকারী ও তদনুযায়ী বিভিন্ন প্রাকৃতিক বলে গণ্য করা হ'ত।

জাতিভেদ প্রথম গুণকর্মবিভাগদ্বারা নির্ণিত হলেও ক্রমশঃ জন্মগত হয়ে পড়েছিল। ঋগ্বেদে জাতিভেদের উল্লেখ না থাকাতে অনুমান করা হয় যে আর্যরা জাতিভেদ সংগে করে' আসেনি। উপনিষদের কোনো ঋষি নিজ বংশের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি 'কারু' (কবি ?) তাঁর পিতা চিকিৎসক ও তাঁর মাতা উপলপ্রক্ষিণী। গ্রীক বিবরণ থেকে অনেকে অনুমান করেন যে খৃষ্টপূর্ব তিনশতের নিকটবর্তী কোনো সময়ে জাতিভেদ বিবর্তিত হয়েছিল।

জাতিভেদদ্বারা সামাজিক কর্মভেদ নির্দিষ্ট হ'ত। ব্রাহ্মণের কর্ম পৌরোহিত্য, ধর্মচর্চা ও বিদ্যাদান, ক্ষত্রিয়ের রাজত্ব ও যুদ্ধ এবং বৈশ্যের লাভজনক ব্যবসা ছিল। এইভাবে প্রত্যেকের বৃত্তি জন্মগত তথা পুরুষানুক্রমিত হওয়ায় সামাজিক সংঘর্ষের হ্রাস হয়েছিল ও কার্যিক নৈপুণ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। অপরপক্ষে এর দ্বারা ব্যক্তিসত্তা খর্বিত হ'ত ও

মৌলিক প্রতিভার বিকাশ বাধা পেত বলে' সমাজ ক্রমশ তার জীবনী-শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

অন্যদেশে অপ্রাপ্য এই অদ্ভুত প্রথার উদ্ভবের মূলানুসন্ধান করলে কতকগুলো কারণের উল্লেখ করা যায়।

জাতিভেদের একটি কারণ বর্ণভেদ। নবাগত শ্বেতকায় আর্যরা আদিবাসী কৃষ্ণকায় অনার্যদের দূরে রাখতো, সমাজে স্থান দিলেও ব্যবধান লোপ পেত না। এই বর্ণভেদ বাহ্যিক বস্ত্রেও সূচিত হ'ত। ব্রাহ্মণের শ্বেত, ক্ষত্রিয়ের রক্ত, বৈশ্যের পীত ও শূদ্রের কৃষ্ণবস্ত্র ধার্য ছিল।

অনার্যের এবং বহিঃশত্রুর সংঘর্ষ জাতিভেদের দৃঢ়তা সম্পাদনে কার্যকর হয়েছিল। এইরূপে জাতিভেদের তিনটি পর্যায় দেখা যায়—বুদ্ধপূর্ব, বুদ্ধ-পরবর্তী ও মুসলমানবিজয়ের পরবর্তী।

আর্যদের মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তিজীবিদের সংগঠন ও তাদের সভ্যপদ পুরুষানুক্রমিক হওয়ায় জাতিভেদ প্রথার জন্মগত হওয়ার সাহায্য করেছিল।

এই বর্ণমূলক সমাজব্যবস্থার সংগে চতুরাশ্রমের বিধি জড়িত ছিল। বস্তুত 'বর্ণাশ্রমধর্ম' আর্যজীবনের মূলসূত্র বলে' অভিহিত। মানুষকে শতায়ু কল্পনা করে' প্রত্যেক জীবনকে চারভাগে বিভক্ত করা হ'ত। প্রথম পাদে ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয় পাদে গার্হস্থ্য, তৃতীয় পাদে বাণপ্রস্থ ও চতুর্থ-পাদে যতি বা সন্ন্যাস।

ব্রহ্মচর্য শিক্ষার, গার্হস্থ্য সংসারধর্ম পালনের, বাণপ্রস্থ ধর্মসাধনের ও যতি মুক্তির কাল ছিল। ব্রহ্মচর্য শিক্ষার কাল হ'লেও চিরজীবন মানুষের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির শিক্ষা চলতো। ব্রহ্মচর্যের শিক্ষায় মনকে বশীভূত ও সংযত এবং কর্মোপযোগী করা হ'ত। গার্হস্থ্যে শিক্ষালব্ধ বিদ্যা ও গুণ সাংসারিক ও সামাজিক মংগলের জন্য প্রযুক্ত হ'ত। বাণপ্রস্থে

অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা আত্মোপলব্ধি ও যতিতে আচারনীতির বন্ধনমুক্ত চিদানন্দের কাল ছিল।

চতুরাশ্রমে মানুষ তিনঋণের পরিশোধ করতো। মানুষ জন্মাবধি ঋণী। ধর্মের পিতা ও প্রতিষ্ঠাতা ঋষিগণের নিকট ঋষিঋণ, দেবগণের নিকট দেবঋণ ও মাতাপিতার নিকট তার পিতৃঋণ। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদাধ্যয়নে, গার্হস্থ্যে যাগযজ্ঞে ও বাণপ্রস্থে তপস্যায় প্রথম দুই ঋণ আর গার্হস্থ্যজীবনে পিণ্ডদান ও বংশরক্ষায় তৃতীয় ঋণ পরিশোধিত হ'ত। যতি ছিল ঋণমুক্ত স্বাধীন অবস্থা।

গার্হস্থ্যাশ্রমে পঞ্চমহাযজ্ঞ ঐহিক ও পারত্রিক সর্বপ্রকার কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। ঐহিক কর্তব্যসমূহের পরিপূরণে পিতৃযজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন করে' ঐহিক সম্পর্ক ও দায়িত্বসমূহ স্বীকার করা হ'ত এবং দেবযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞের দ্বারা পারত্রিক মংগলের ভিত্তি স্থাপিত হ'ত।

জীবনমরণকে, ইহপরকালকে এইভাবে একসূত্রে গ্রথিত করা সহজ নয়। আর্যগণের পক্ষেও উভয়লোকের সামঞ্জস্যরক্ষা সম্ভব হয়নি। কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, মায়াবাদ প্রভৃতি আদর্শের উদ্ভবে জাতীয় জীবনে ঐহিক ব্যাপারে নিশ্চেষ্টতার সৃষ্টি করেছিল এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে' জাতির অধোগতি সুনিশ্চিত করেছিল।

চতুরাশ্রম, তিনঋণ, পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতির বিধান জনপদসমাজকে অবনতি থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল বটে কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত অনৈহিকতা, ধর্মপ্রাণতা তথা উদ্যোগহীনতা আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ রয়ে গেছে।

অন্যদিকে যে প্রথম স্বাধীন চিন্তাধারা আর্যদর্শনের গৌরবময় প্রারম্ভ সূচিত করেছিল তাও ক্রমে ঐতিহ্যশাসিত ও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শুষ্ক আচারের মরুবালুরাশি' ক্রমান্বয়ে 'বিচারের স্রোতঃপথ' গ্রাস করেছিল। আর্যদের জীবনযাত্রা শত অনুশাসনে শাসিত হয়ে জড় ও যান্ত্রিক হয়ে পড়েছিল।

আর্য জীবনযাত্রার মতো শিক্ষাদর্শের মধ্যেও এই উৎকর্ষাপকর্ষের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

আর্যশিক্ষাবিধিতে ব্যক্তিগত ও শ্রেণিগত অধ্যাপনার এবং জ্ঞানিক ও কার্যিক অভ্যাসসমূহের যে সুসমঞ্জস মিশ্রণ হয়েছিল আধুনিক শিক্ষাবিধি তদনুরূপ সামঞ্জস্যের সৃষ্টি এখনও করতে পারেনি। আরো বড় কথা এই যে সেদিনের শিক্ষার কার্যিক অংশ আয়ত্ত করা হ'ত বাস্তবিক কর্মক্ষেত্রে। প্রত্যেক জাতি তার কর্মের স্বাভাবিক প্রেক্ষিতে এমনভাবে শিক্ষালাভ করতো যে বিদ্যা ও তার প্রয়োগ একাধারে হ'ত, জ্ঞানে আর কাজে ছেদ ঘটতো না।

শিক্ষাকেন্দ্রের আবাসিক পরিবেশ ও অনন্যসাধারণ ছিল। গুরুকুলে পিতাপুত্রসম্পর্কের চারিদিকে যে বাস্তবিক পারিবারিক প্রেক্ষিত গড়ে' উঠেছিল আধুনিক আবাসিক বিদ্যালয়ে তার অনুরূপ আবহাওয়ার প্রবর্তন করা যায়নি।

অর্থাভাবে আজকে ভারতের জনশিক্ষা যথেষ্ট বিস্তারলাভ করতে পারছেনা। প্রাচীন তপোবনে, অতি অল্প ব্যয়ে যে শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন হয়েছিল, মধ্যযুগের গ্রাম্য টোলচতুষ্পাঠীপাঠশালায় যার ছায়া পড়েছে সেই পর্ণকুটিরাশ্রিত, সামান্য বিদ্যালয়ের আদর্শ যে আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রাচীন তপোবনের গুরু একক শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৫।২০ থেকে পাঁচশত পর্যন্ত শিষ্যের অধ্যাপনা করতেন। তিনি পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা অগ্রসরতর শিষ্যদের সহায়তায় অধ্যাপনা করতেন বলেই এতগুলি

শিষ্যকে, ব্যক্তিগত যত্ন নিয়ে, শুধু বিদ্যায় নয়, ধর্মকর্মের কার্যিক প্রয়োগেও শিক্ষিত করে' তুলতে পারতেন। এরই ছায়া দেখি বাংলার পাঠশালায় 'সর্দারপোড়া'র সাহায্যে পড়ানোর ব্যবস্থায়। গ্রাম্য এক-শিক্ষক-সমন্বিত বিদ্যালয়ের সমস্যার সমাধানের জন্য ইংরেজ বেল এবং ল্যাংকাষ্টার তার অনুকরণে স্বদেশের স্কুলে এবং ভারতের মিশনারী বিদ্যালয়ে 'মনিটরে'র প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের তপোবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিশেষত্ব ছিল। আধুনিকতম শিক্ষাদর্শের 'Rural University'র অর্থ বাস্তবিক গ্রামজীবনের সংগে জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়। যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাকৃতিক পরিবেশে স্থাপিত করলেই তা গ্রাম্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে না। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেই অসাধ্য সাধন করেছিল, অর্থাৎ অত্যুচ্চ দর্শনবিজ্ঞান ও ধর্মের আলোচনার সংগে গ্রাম্য জীবনধারাকে একসূত্রে গ্রথিত করতে পেরেছিল।

অপরপক্ষে অগণতান্ত্রিক ভেদের অনুপ্রবেশ, শুষ্ক আচারনীতির প্রভাব ও মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীলতা এই শিক্ষাকে জড় ও যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত করেছিল। এতে শিক্ষার সাংস্কৃতিক অংগের বিনাশ হয়েছিল। এই ফল বৈশ্যের শিক্ষায় সবচেয়ে বিষময় হয়েছিল। শিল্পী ও কারিগরদের একান্ত বৃত্তিমুখী শিক্ষা নিরক্ষরতার প্রশ্রয় দিয়ে তাদের সমাজের নিম্নতম স্তরে ঠেলে ফেলেছিল। কুমোর-কামার-ছুতোর-চামার প্রভৃতির সামাজিক অবস্থা দেখে অনুমান করা কঠিন যে তারা কোনোদিন সমাজের সম্মানিত সভ্য ছিল। বর্তমানে বৃত্তিশিক্ষার ওপর যে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে তার মধ্যেও সেই পরিণামের বীজ নিহিত আছে ; সাধারণ শিক্ষার পরিবর্তে কোনো 'লাইনে' চলে' যাওয়ার প্রয়াস চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক।

আর্যযুগ গৌরবময় যুগ। সব দিক দিয়ে আর্যশিক্ষার সমতুল শিক্ষাবিধি সম্ভবতঃ গ্রীসের বিদ্যায়তনেও দেখা যায়নি ; কিন্তু একথা বিস্মৃত হ'লে চলবেনা যে তারই মধ্যে সমাজের অধঃপতনের বীজও লুকিয়ে ছিল। পুরাতনকে পুনরুজ্জীবিত করতে হ'লে অভিজ্ঞতাসঞ্জাত জ্ঞানের আলোকে তার দোষগুলিকে বেছে দূর করতে হ'বে তারপর আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের আবিষ্কারের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠতম তার সংগে প্রাচীনের অনবদ্য অংশের সংমিশ্রণে নূতন শিক্ষাব্যবস্থার গঠন করতে হবে।

ইসলামীয় শিক্ষা

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগের দ্বিতীয় অংশ গণনা করা হয়ে থাকে। এই যুগ মুসলমান সাম্রাজ্যের যুগ। মুসলমানের প্রাধান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সংগে দেশের শিক্ষাসংস্কৃতির মধ্যে অনেক পরিবর্তন এনেছিল, এক বিজাতীয় সংস্কৃতির ধারা এদেশে প্রবাহিত হয়েছিল এবং দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত ও অত্যাচারিত হয়ে পড়েছিল।

মুসলমান নবাবেরা কিন্তু নিজ ধর্মের লোকের পক্ষে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কোরাণের বিধানে শিক্ষাদান রাজধর্মের অংগীভূত এবং মুসলমান সমাজে শিক্ষকের স্থান উচ্চ।

ভারতের মুসলমান সম্রাটগণ বড় বড় পণ্ডিত, সাহিত্যিক, কবি প্রভৃতিকে রাজসভায় পুরস্কৃত ও সম্মানিত করতেন, বিদ্যার্থিদের বৃত্তি দিতেন এবং অনেক সম্রাট অনাথ ও ক্রীতদাসদের শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইসলামীয় শিক্ষার দুই প্রকার প্রতিষ্ঠান মক্তব ও মাদ্রাসা সাধারণত মসজিদের সংগে সংশিষ্ট থাকতো। প্রথমে যারা নূতন ইসলামধর্ম গ্রহণ করতো তাদের 'কলিমা' ও কোরাণের অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য অংশ মুখস্থ করিয়ে দেবার জন্য মক্তবগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারপর এখানে সামান্য পারসী লেখাপড়া ও সাধারণ অংকের নিয়ম শেখানো হ'ত। এইভাবে মক্তবগুলি মুসলমানদের প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে দাঁড়ায়। মাদ্রাসা উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। ব্যাকরণ, অলংকার, তর্কশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, আইন চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় এখানে পড়ানো হ'ত। শিক্ষার মাধ্যম ছিল পারসীভাষা ও আরবীভাষার শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর থেকে মুসলমানেরা ভারতে উঁকিঝুঁকি মারলেও মাহ্‌মুদ গজনীকে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যস্থাপনের অগ্রদূত বলা যায়। ১০০০ থেকে ১০২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সপ্তদশটি অভিযানে লুঠপাটের সংগে ভারতের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করলেও স্বদেশে বিদ্যোৎসাহী বলে খ্যাত ছিলেন। তাঁর সময়ে গজনী শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং শাহ্‌নামা-রচয়িতা ফিরদৌসী তাঁর সভায় ছিলেন। কথিত আছে ভারতে গোয়ালিয়রের দুর্গাবরোধকালে দুর্গের রাজা নন্দরায় তাঁকে স্বরচিত একটি স্তুতিপূর্ণ কবিতা উপঢৌকন দেওয়ায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে পোনেরোটি দুর্গ পুরস্কারস্বরূপ দান করেন। ঐতিহাসিক আলবেরুনি বলেন যে মাহ্‌মুদের পুত্র মাসুদ ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন চিকিৎসা প্রভৃতি বিদ্যার আলোচনা করতেন ও ভারতীয় সাহিত্যের কিছু কিছু আরবী-পারসীতে অনুবাদ করেছিলেন।

মাহ্‌মুদ গজনীকে মুসলমান সাম্রাজ্যের অগ্রদূত বল্লে মহম্মদ ঘোরীকে (খৃঃ ১১৭৪—১২০৬) তার প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। তিনি আজমীরে মন্দিরের ধ্বংস করে' মসজিদ ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাছাড়া তিনি বহু ক্রীতদাসকে সাহিত্য ও রাজকীয় ব্যাপারসমূহে সুশিক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাদের মধ্যে অন্যতম কুতুবুদ্দীন তাঁর ভারতীয় সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

কুতুবুদ্দীন ১২১৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে' দাস-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু মন্দির ধ্বংস করে' মসজিদ ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর কর্মচারী বখতিয়ার বিক্রমশীলা ধ্বংস করেছিলেন। এই বংশের আলতামসের কন্যা সুলতানা রিজিয়া বিদ্যাবুদ্ধিতে অনন্যসাধারণা ছিলেন। দারিদ্র্যব্রতী, সাধু নসিরুদ্দীন (১২৪৬—১২৬৬) জালন্ধরে এক মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন। বলবনের

সময়ে (১২৬৬—১২৮৭) চেংগিস খাঁর অত্যাচারে পলাতক বহু পণ্ডিত-সমাগমে দিল্লী মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক কেন্দ্রে পরিণত হয়। কবি আমীর খস্রু বলবনের পুত্রের শিক্ষক ছিলেন।

খিলিজি বংশের (১২৯০—১৩২০ খৃঃ) মধ্যে জালালুদ্দীনের সভায় বহু কবি, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সংগীতজ্ঞ প্রভৃতির সমাগম হয়েছিল। তিনি দিল্লীর রাজকীয় গ্রন্থাগারের স্থাপন করে' আমীর খস্রুকে তার অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করেন। তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন সম্পত্তিহরণ ও অন্যান্য অত্যাচারে শিক্ষার অনিষ্ট করেন। কিন্তু দিল্লী সেই সময়ে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে এত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তার গৌরব নষ্ট হয়নি। কবি আমীর খস্রু ও দার্শনিক নিজামুদ্দীন আউলিয়া এই সময়ে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। পরে আলাউদ্দীন শিক্ষার কিছু কিছু সমাদর করেন ও তাঁর পুত্র মুবারক পিতার অপহৃত সম্পত্তি শিক্ষাখাতে প্রত্যর্পণ করেন।

তুঘলক বংশের (১৩২৫—১৪১৩) প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দীন বিদ্যোৎসাহী আর মহম্মদ তুঘলক মহাপণ্ডিত, বাগ্মী ও তার্কিক ছিলেন। তাছাড়া চিকিৎসা, তর্ক, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের ও গ্রীকদর্শনের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তিনি শিক্ষার জন্য মুক্তহস্তে দান করতেন কিন্তু তাঁর খামখেয়ালি ব্যবহার দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনাশ করেছিল। ইবন্ বাটুটা ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে লিখেছেন যে রাজধানীর স্থানান্তরকরণের ফলে দিল্লী মরুভূমিপ্রায় হয়ে পড়েছিল এবং যে সব মক্তব-মাদ্রাসায় হাজার হাজার ছাত্রের সমাগম হ'ত সেগুলি জনশূন্য ছিল।

ফিরোজশাহ্ শুধু তুঘলকবংশের নয়, সমগ্র পাঠান রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজে সুশিক্ষিত ছিলেন এবং শিক্ষার জন্য বৎসরে ছত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত

নোতুন রাজধানী ফিরোজাবাদ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কবি জালালুদ্দীন রুমি তাঁর সভা অলংকৃত করেছিলেন। ঐতিহাসিক চিহ্ন-সমূহের রক্ষার চেষ্টায় তিনি অশোকস্তম্ভ দুইটি দিল্লীতে আনিয়েছিলেন। কথিত আছে যে তিনি আঠেরো হাজার দাসের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোরাণের অনুলিপিকরণে ও ধর্মালোচনায় নিয়োজিত হ'ত আর বারো হাজার জনকে কারিগরদের কাছে শিক্ষানবীশী করিয়ে উৎকৃষ্ট শিল্পী করে' তোলা হয়েছিল। ফেরিস্তা বলেন যে তিনি অন্যূন তিরিশটি মাদ্রাসার নির্মাণ বা সংস্কার-সাধন করে' সেগুলির ব্যয়ের জন্য করের অংশ নির্দিষ্ট করে' দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফিরোজশাহী মাদ্রাসা আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। শিক্ষক ও ছাত্রগণের বাসের জন্য মাদ্রাসার মধ্যে স্থান ছিল এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকতো। ছাত্রদের শুধু বিদ্যাদান করা হ'ত না, তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিরও চেষ্টা করা হ'ত। দূর-দেশাগত অতিথিদের জন্য পৃথক গৃহ নির্দিষ্ট ছিল। গরীব ছাত্ররা মসজিদের ভাণ্ডার থেকে সাহায্য পেত এবং জলপানি ও বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। রাষ্ট্রীয় দান ও সাহায্যভাণ্ডার থেকে এর ব্যয় নির্বাহ হ'ত।

এতদিনে, মুসলমানসাম্রাজ্যের শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ায়, হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ভাব আত্মপ্রকাশ করছিল। মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলনা কিন্তু এ গুলি অত্যন্ত ধর্মকেন্দ্রিক হওয়ায় হিন্দুদের এখানে শিক্ষালাভ সম্ভবপর হ'তনা। অপরপক্ষে হিন্দুগণ উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হ'তে আরম্ভ করায় তাদের আরবী ও পারসী শিখতে হ'ত এবং মুসলমানেরাও হিন্দুদের ভাষা শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করতো। ফিরোজ তুঘলক নগরকোটের জ্বালামুখী-মন্দিরের গ্রন্থাগারের কয়েকটি বই

পারসীভাষায় অনুবাদ করার জন্য কয়েকজন হিন্দু পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেছিলেন।

এই বংশের রাজত্বকালের মধ্যে তৈমুরলঙের আক্রমণে প্রভূত অনিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও শেষ নবাব সুলতান সৈয়দ আলা-উদ্দীনের সময়ে দিল্লীর একশো মাইল দূরে বদাওন একটি শিক্ষাকেন্দ্ররূপে বিখ্যাত হয়েছিল।

লোদীবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান বহ্‌লুল আগ্রার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সিকন্দর লোদী তাঁর রাজধানী আগ্রায় স্থানান্তরিত করে' তাকে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। তিনি স্বয়ং কবি ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর সেনানীদের পক্ষে শিক্ষিত হওয়া বাধ্যতামূলক করেছিলেন। তিনিও বহু মন্দির ধ্বংস করে' মসজিদ ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সকল ধর্মকে সমান বলে' বিশ্বাস করার অপরাধে বুধন নামক এক ব্রাহ্মণকে হত্যা করেছিলেন।

তথাপি এই সময়ে হিন্দুমুসলমানের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ও পরস্পরের ভাষার আলোচনা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। হিন্দুরা রাজ-সভায় উচ্চপদ পাওয়ার জন্য আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করতো এবং মুসলমানেরা ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ করার জন্য এদেশী ভাষা শিখতো। এই সময়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের কতকগুলি প্রয়োজনীয় বই আরবী ও পারসী ভাষায় অনূদিত হয়। লোদীবংশের রাজত্বকালে এই বর্ধিত আদানপ্রদানের ফলে পশ্চিমা হিন্দী ও পারসী ভাষার সংমিশ্রণজাত, পারসী লিপিতে লিখিত উর্দু ভাষার উদ্ভব হয়। 'উর্দু' শব্দের অর্থ শিবির, সম্রাটের শিবিরে উদ্ভব হওয়ার জন্য ভাষাটির এইরূপ নাম হয়। মুসলমান রাজত্বের আর কোনো সাংস্কৃতিক ফল না থাকলে কেবলমাত্র উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের জন্য তা স্মরণীয় হয়ে থাকতো।

দিল্লী ভিন্ন দক্ষিণ ভারতের ছোটখাট কতকগুলি মুসলমান রাজ্যেও মুসলমানী শিক্ষার প্রসার ঘটছিল।

বাহ্‌মনি রাজ্যের (১৩৪৭-১৫২৬) প্রত্যেক সুলতানই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বাহ্‌মনি বংশের তৃতীয় সুলতান মাহ্‌মুদশাহ্‌ অনাথদের শিক্ষার জন্য অনেক নগরে মক্তব ও রাজধানীতে একটি মাদ্রাসা (১৩৮৭) স্থাপিত করেছিলেন। তিনি সরকারি ব্যয়ে বিদ্বান শিক্ষকদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। চতুর্থ সুলতান ফিরোজশাহ্‌ দেশবিদেশের পণ্ডিতদের আহ্বান করে' স্বরাজ্যে আনাতেন ও জ্যোতিবিজ্ঞানের চর্চার জন্য একটি মানমন্দিরের স্থাপন করেছিলেন। পঞ্চম সুলতান আহ্‌মদশাহ্‌ বিজাপুরের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করেছিলেন ও নিজরাজ্যে এক বিরাট মাদ্রাসার স্থাপন করেছিলেন। ষষ্ঠ সুলতান মাহ্‌মুদশাহের মন্ত্রী মহম্মদ গাওয়ান দাক্ষিণাত্যের প্রায় প্রত্যেক মাদ্রাসার জন্য দান করেছিলেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদারের বিরাট গ্রন্থাগারে তিন হাজার পুস্তক ছিল। আহ্‌মদনগরে বাহ্‌মনি সুলতানদের একটি রাষ্ট্রীয় গ্রন্থশালাও ছিল। বাহ্‌মনি রাজ্যের এই সহায়তায় আরবী ও পারসী সাহিত্যের শিক্ষা যতদূর সম্ভব বিস্তার লাভ করেছিল।

বিদ্যাপুর বা বিজয়পুর নামে বিজাপুররাজ্য চালুক্য ও যাদববংশের সময় থেকে ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ ছিল। মুসলমানেরা এখানকার বিদ্যাপীঠের গ্র্যানাইট পাথরের তৈয়ারি তিনতলা প্রাসাদ অধিকার করে' ইস্‌লামীয় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত করে। বিজাপুরের নবাবেরা সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ও আদিলশাহী গ্রন্থাগারের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আওরংজীব অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব আছে। এই রাজ্যে মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুদের

অত্যন্ত প্রভাব ছিল এবং ইব্রাহিম আদিল শাহের সময় থেকে রাষ্ট্রীয় হিসাব হিন্দীভাষায় রক্ষিত হ'ত।

গোলকুণ্ডার নবাবদের মধ্যে মহম্মদ কুলি কুতব শাহ্ হায়দ্রাবাদের চাহারমিনার মসজিদের নির্মাণ করিয়েছিলেন। এর সংগে একটি মাদ্রাসা ছিল এবং চারটি মিনারের ভিতর শিক্ষক ও ছাত্রদের বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল। এ ভিন্ন শিক্ষকদের নিজগৃহে মক্তব ও মাদ্রাসা খুলে অধ্যাপনা করবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হ'ত। এগুলিতে ছাত্রেরা মাটিতে বা তক্তপোষে আসন করে' বসে' পারসী ভাষা শিখতো ও কোরাণ মুখস্থ করত। তারা খাগের বা অন্য কোনো প্রকারের কলম দিয়ে চীনদেশীয় কাগজে লিখতো।

মালোয়ারাজ্যের স্থলতানেরা কেবল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেননি, অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার জন্যও শিক্ষয়িত্রীর নিয়োগ করতেন। স্থলতান গিয়াস্থদ্দীন যখন বেশবিন্যাস করতেন তখন সত্তরজন মেয়ে তাঁকে কোরাণ আবৃত্তি করে' শোনাতো।

জৌনপুররাজ্যে শিক্ষা লাভ করে' ফরিদ (শেরশাহ্) তাঁর পিতাকে লিখেছিলেন যে জৌনপুরের শিক্ষা সাসারামের চেয়ে উৎকৃষ্ট। এখানকার নবাব ও বেগমদের উৎসাহে এই স্থান প্রায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। কথিত আছে যে নবাব সাদৎ খাঁ নিশাপুরী এখানকার পণ্ডিতদের কাছে আশানুরূপ সম্মান না পেয়ে এই কেন্দ্রকে নষ্ট করেন।

বাংলাদেশে বখতিয়ার খিলিজি নানাস্থানে মাদ্রাসার স্থাপন করেন। শাসনকর্তা গয়াস্থদ্দীন (১২১২-১২২৭) লক্ষ্মণাবতীতে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। বিদ্যাপতির পদে 'প্রভু গয়াস্থদ্দীন স্থরতান' বলে' তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা কনিস (১৩৮৫-১৩৯২) পণ্ডিতদের বৃত্তি দিতেন। অনেকে অনুমান করেন যে তিনি আগে কংসনারায়ণ

বা গণেশ নামে হিন্দু রাজা ছিলেন এবং মহাকবি কৃত্তিবাসকে রামায়ণের অনুবাদে উদ্যোগী করেছিলেন।

বাংলাসাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনে মুসলমান নবাবগণের দান প্রচুর। তাঁদের আগ্রহে রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতের বহু অনুবাদ হয়েছিল। নসির শাহ্ (১২৮২-১৩২৫) মহাভারতের প্রমথ অনুবাদ করিয়েছিলেন। বিদ্যাপতি তাঁর কথা বলেছেন—

"সো নসিরা শাহ জানে,
যাক হানিল মদন বাণে,
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভণে।"

নবাব হুসেন শাহ অনেক মক্তব ও মাদ্রাসার স্থাপন করেন। তিনি প্রথম জীবনে মন্দির ধ্বংস করলেও পরজীবনে রূপ ও সনাতনের প্রভাবে সেগুলি আবার নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বৈষ্ণবসাহিত্যের এতদূর রসগ্রাহী হয়েছিলেন যে বৈষ্ণব কবি বলেছেন—

"শ্রীযুত হুসন, জগতভূষণ,
সোহি এ রস জান।"

হুসেন শাহ্ মালাধর বসুকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দিয়ে ভাগবতের অনুবাদে প্রবৃত্ত করেন। তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁ পরাগলী মহাভারতের রচয়িতা শ্রীকরণনন্দীর সহায়তা করেন। তাঁরা বহু আরবী ও পারসী গ্রন্থেরও বংগানুবাদ করিয়েছিলেন। মুসলমান রাজগণের এই পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে বাংলাসাহিত্য সহজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অবজ্ঞা ও হিন্দুরাজগণের উৎসাহের অভাব অতিক্রম করে' প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতো না। পরে এঁদের অনুকরণে হিন্দু রাজারাও বাংলাসাহিত্যের সমাদর করতেন।

নবাব মুর্শীদকুলি খাঁ (১৭০৪-১৭২৫) অনেক বিদ্বান পণ্ডিতের ও দুই সহস্র কবি, চারণ ও সংগীতজ্ঞের প্রতিপালন করতেন।

এইরূপ আদানপ্রদানের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এমন কতকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছিল যেখানে হিন্দুমুসলমান উভয়েই পড়তো। পাঠান রাজত্বের পর মোগল সাম্রাজ্যের সময়ের শিক্ষার কিছু পূর্ণতর বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রথম মোগল সম্রাট বাবর (১৫২৬-১৫৩০) পণ্ডিত ছিলেন ও "বাবরী" নামে বিশিষ্ট লিপিশিল্পের প্রবর্তন করেন। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি ভারতীয় শিক্ষার সম্বন্ধে লিখেছেন যে—'হিন্দুস্তানে কোনো মাদ্রাসা নেই'। ভারতীয় নক্ষত্রবিজ্ঞানের আলোচনাপ্রসংগে লিখেছেন যে তখন উজ্জয়িনী, ধার ও মালোয়ায় (মাণ্ডু) মানমন্দির ছিল কিন্তু ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান অতি পশ্চাদ্‌পদ হয়ে পড়েছিল। বাবর তাঁর রাজ্যের পূর্তবিভাগের হাতে অন্যান্য কাজের সংগে 'আখ্‌বরের' প্রকাশ এবং মক্তব ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠার ভার দিয়েছিলেন।

পণ্ডিত ও গ্রন্থকার হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৫৬) ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা করতেন। তাঁর সময়ে ভৌগোলিক ও নাক্ষত্রিক মণ্ডলের (Globe) ব্যবহার ছিল। তিনি জনসাধারণকে আহ্‌লি সাদৎ, আহ্‌লি দৌলত ও আহ্‌লি মুরাদ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। এর প্রথম শ্রেণীতে ছিল ধার্মিক, সাধক ও পণ্ডিতগণ। প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার তিনি তাদের অভ্যর্থনা করতেন। তাঁর নিজের একটি বিশেষ গ্রন্থাগারও ছিল।

হুমায়ুনের রাজত্বের মাঝখানে পাঁচ বৎসর (১৫৪০-৪৫) পাঠান শেরশাহ্ রাজত্ব করেছিলেন। এই অল্পকালের মধ্যে তিনি জয়পুরের নিকটবর্তী নারনৌলে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

মোগল সম্রাটদের শ্রেষ্ঠ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) সমগ্র মুসলমান-রাজত্বকালের মধ্যে অনন্যসাধারণ ছিলেন। তিনি নিরক্ষর বলে' প্রচারিত হ'লেও সে-কথা বিশ্বাস করা কঠিন; কারণ, প্রথমতঃ হুমায়ুন তাঁর জন্য আব্দুল লতিফ নামক শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন বলে' জানা যায় এবং দ্বিতীয়ত, তিনি আলোচনাসভায় এত বৈদগ্ধ্যের সংগে যোগ দিতেন যা নিরক্ষরের পক্ষে সহজ নয়। তাঁর ফতেপুর সিক্রির ইবাদৎখানায় প্রতি শুক্র ও রবিবার জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, নীতিজ্ঞ, ধার্মিক, পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি 'আহ্‌লি সাদৎ' এসে নির্ভয়ে নানা আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। শ্রেষ্ঠ বক্তাদের টংকা ও আশরফি পুরস্কার দেওয়া হ'ত। তাঁর সভায় গোয়া থেকে মিশনারিরা আসতেন এবং তিনি আবুল ফজলকে সুসমাচারের (Gospels) অনুবাদ করতে বলেছিলেন। বস্তুত আন্তরিকভাবে নানা ধর্মের আলোচনার পর তিনি সর্বধর্মসমন্বয়ে 'দীন ইলাহি' বলে' এক নোতুন ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন।

তিনি রামায়ণ, মহাভারত, অথর্ববেদ, হরিবংশ, নলদময়ন্তীর কথা, বত্রিশসিংহাসন প্রভৃতির অনুবাদ করিয়েছিলেন। অনুবাদকদের এই-গুলির অর্থ বুঝিয়ে দেবার জন্য হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করা হ'ত। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের নোতুন বই লিখিয়েছিলেন।

মানুষের প্রথম ভাষা কি তা আবিষ্কার করার জন্য তিনি এক অদ্ভুত পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন বলে' শোনা যায়। তিনি নাকি পঁচিশটি নবজাত শিশুকে বোবা ধাত্রীগণের তত্ত্বাবধানে, সম্পূর্ণ নির্জন স্থানে পালিত করেছিলেন। বারো বৎসর বয়সে যখন তারা কোন্ ভাষা বলে দেখবার জন্য তাদের রাজসভায় আনা হ'ল, তখন দেখা গেল যে তারা কোনো ভাষা জানেনা,—বোবা!

অন্যান্য মুসলমান সম্রাটদের মতো তাঁরও গ্রন্থাগারের শখ ছিল এবং দিল্লীর রাজকীয় গ্রন্থশালায় তিনি অনেক নূতন গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। ফৈজি মৃত্যুকালে তাঁর জন্য স্বসংগৃহীত ৪৬০০ গ্রন্থ রেখে গেছিলেন।

তিনি একটি চিত্রশালা স্থাপন করেছিলেন এবং শিল্পিদের পারিশ্রমিক ও পুরস্কার দিতেন। লিপিশিল্পের (Calligraphy) উন্নতিকল্পে তিনি বহু যত্ন করেছিলেন। এই শিল্প বাবর থেকে আরম্ভ করে' প্রায় সকল মোগল সম্রাটেরই প্রিয় ছিল।

তানসেন তাঁর সভার শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং অন্যান্য সংগীতজ্ঞদেরও তিনি পুরস্কৃত করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীতকলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

পুত্র-পৌত্রাদির শিক্ষার জন্য তিনি বহু অর্থব্যয়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের নিযুক্ত করতেন এবং সাধারণের শিক্ষার দিক দিয়ে তাঁর রাজত্বকাল এক নবযুগের সূচনা করে। মুসলমান সম্রাটগণের মধ্যে তিনিই প্রথম হিন্দু-মুসলমানের শিক্ষার জন্য সমান চেষ্টা করেন। তাঁর যত্নের ফলে হিন্দু ও মুসলমানগণ অনেক ক্ষেত্রে এক বিদ্যালয়ে পড়তে আরম্ভ করে।

আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় যে আকবর তাঁর রাজ্যের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। 'একটি রাজকীয় ঘোষণায় তিনি বলেছিলেন যে বিদ্যার্থিদের জীবনের অনেকাংশ নানা গ্রন্থপাঠে অযথা অপচয় করা হয়। এর প্রতিকারকল্পে তিনি লিখেছিলেন যে বালকদের সরল অক্ষরগুলি আগে লিখতে ও পরে পড়তে শেখাতে হবে এবং এই কাজ দুইদিনে সমাপ্ত হবে। তারপর এক সপ্তাহ যুক্তাক্ষর লেখার অভ্যাস চলবে। তারপর বালকেরা কিছু গদ্যপদ্য, নীতি ও স্তোত্র কণ্ঠস্থ করবে। তারা

যাতে শিক্ষকের সহায়তায় প্রত্যেক বিষয়ের অর্থ নিজে গ্রহণ করতে পারে তারজন্য তৎপর হ'তে হবে। শেষে 'বয়েৎ' এর অনুলেখনের সাহায্যে তাদের লিপিশিল্প ও 'টানা' লেখার অভ্যাস করাতে হবে। অক্ষরজ্ঞান, শব্দার্থ ও 'বয়েৎ' এর প্রতি শিক্ষককে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। এই পদ্ধতিতে শিখলে বালকেরা বহু বৎসরের শিক্ষা একমাসে আয়ত্ত করতে পারবে।

মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমের জন্য তিনি নীতি, গণিত, অংকের বিশিষ্ট লিপি, কৃষি, জমি-জরিপ, ক্ষেত্রতত্ত্ব, নক্ষত্রবিদ্যা শারীরবিদ্যা, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, শাসনবিধি, চিকিৎসাবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়কে অবশ্যপাঠ্য এবং সংস্কৃতের ছাত্রদের জন্য ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত ও পাতঞ্জল প্রয়োজনীয় বলেছেন।

আকবরের পদ্ধতির প্রধান বিশেষত্ব হ'ল তার দ্রুততা। বহু গ্রন্থপাঠে সময় নষ্ট করার চেয়ে বহু বিষয়ের পরিচয় লাভ করাকে তিনি বাঞ্ছনীয় বলেছেন এবং তাঁর নির্বাচিত পাঠ্যক্রমে বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে। হিন্দুদের শিক্ষাপদ্ধতির থেকে পড়ার আগে লেখার পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি গুরু-শিষ্যের সহযোগিতার আদর্শ এবং স্বশিক্ষা ও মুখস্থবিদ্যার সংমিশ্রণের প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

আকবরের আদর্শ উচ্চ হ'লেও তখন শিক্ষার পৃথক রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল না বলে' তা কার্যকর হ'তে পারেনি। তা সত্ত্বেও তিনি দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রি প্রভৃতি স্থানে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের অধ্যাপনায় বহু বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়েছিলেন। অনুরূপ-ভাবে তিনি শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি করেছিলেন।

জাহাংগীর (১৬০৫-১৬২৫) নিজে সুশিক্ষিত ছিলেন এবং মাদ্রাসার

প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের জন্য অর্থব্যয় করতেন। কোনো ধনী ব্যক্তি উত্তরাধিকারী না রেখে মারা গেলে তার সম্পত্তি মাদ্রাসা ইত্যাদির ব্যয়নির্বাহের জন্য রাষ্ট্র গ্রহণ করতো। তিনি চিত্রকর ও সংগীতজ্ঞদের সমাদর করতেন। আগ্রা তাঁর রাজত্বকালে শিল্প ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র ছিল।

শাহ্‌জাহান (১৬২৭-১৬৫৮) বিদ্যার চেয়ে শিল্প ও স্থাপত্যের অধিক সমাদর করলেও মাদ্রাসার নির্মাণ ও সংস্কারের জন্যও অর্থব্যয় করেছিলেন। অপরপক্ষে বর্ণিয়র লিখে গেছেন যে তাঁর রাজত্বকালে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল এবং ধনী ব্যক্তিরাও নিজেদের ধনশালিতা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে শিক্ষার সহায়তা করতো না। বর্ণিয়রের বর্ণনায় দেশে রাজভয়ের সূচনা করে।

শাজাহানের পুত্র দারাশিকো আরবী, পারসী ও সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি হিন্দুবিদ্যার গুণগ্রাহী ছিলেন ও উপনিষদাদি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। পিতার পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করতে পারলে ভারতবর্ষের শিক্ষানৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিণতি পেতো।

গোঁড়া মুসলমান আওরংজীব (১৬৫৮-১৭০৭) হিন্দুশিক্ষার হানি করে' মুসলমানের শিক্ষার প্রসার করেছিলেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হিন্দুদের বিদ্যাপীঠ ও মন্দির ধ্বংস করতে ও তাদের শিক্ষা ও ধর্মপ্রচার রহিত করতে আজ্ঞা দেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে দেশের মসজিদগুলির সংস্কার করেন এবং লক্ষ্ণৌয়ের ওলন্দাজদের এক গির্জা অধিকার করে' তাতে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পণ্ডিতদের বেতন ও বিদ্যার্থিদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন এবং বহু

মক্তব ও মাদ্রাসার স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সময়ে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে শিয়ালকোটের অভ্যুত্থান হয়েছিল।

আওরংজীব নিজে পণ্ডিত ও খোজাদের তত্ত্বাবধানে ধর্ম, বিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ববিষয়ে বহু অধ্যয়ন করতেন ও দিল্লীর রাজকীয় গ্রন্থাগারে বহু ইসলামীয় ধর্মপুস্তকের সমাবেশ করেছিলেন।

আওরংজীবের বাল্যের এক শিক্ষক মোল্লাশাহের সংগে কথোপকথন থেকে তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা ও তৎসম্বন্ধে তাঁর মতামত জানা যায়। মোল্লা শাহ্ নাকি আওরংজীবকে শিখিয়েছিলেন যে ফিরিংগিস্তান (য়ুরোপ) সামান্য একটি দ্বীপ মাত্র, তার রাজগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পোর্তুগালের, তারপর ওলন্দাজদের ও তারপর ইংলণ্ডের রাজা; ফরাসী প্রভৃতি দেশের রাজগণ সামন্তরাজের সংগে তুলনীয় এবং ভারতের মোগলসম্রাটগণের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে' বলেছিলেন যে সমগ্র য়ুরেশিয়ার রাজগণ তাঁদের ভয়ে কম্পিত। এইরূপ শিক্ষাদানের জন্য গঞ্জনা দিয়ে আওরংজীব বলেন যে মোল্লাশাহের উচিত ছিল তাঁকে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের বিশেষত্ব, ঐশ্বর্য, শক্তি, যুদ্ধরীতি, আচারব্যবহার, ধর্ম, শাসনব্যবস্থা ও স্বার্থের সংগে পরিচিত করে' দেওয়া; ইতিহাসপাঠের মাধ্যমে ওইসব রাজ্যের উৎপত্তি, উন্নতি, ধ্বংস এবং বড় বড় বিপ্লব ও পরিবর্তনের বিবরণ ও কারণসমূহ শেখানো; কোন্ অসাধারণ গুণের দ্বারা য়ুরোপীয় রাজগণ রাজ্যবিস্তার করতে পেরেছে তা বুঝিয়ে দেওয়া এবং আশপাশের রাজ্যসমূহের ভাষা শেখানো। তার পরিবর্তে আওরংজীবকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তারও বিবরণ তিনি দিয়েছেন। দশবারো বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁকে কেবল আরবী ভাষাই শেখানো হয়েছিল

এবং অত্যধিক পরিমাণে ব্যাকরণ ও নীতি পড়ানো হয়েছিল। এইসব নীতি যদি আরবী ভাষায় না শিখিয়ে মাতৃভাষায় শেখানো হ'ত তবে অতি সহজেই তা আয়ত্ত করা যেত। মোল্লাশাহ্ যে দর্শনশিক্ষা দিয়েছিলেন তা শ্রান্তিজনক ও গোঁড়ামির উৎপাদক। তিনি যে উদ্ভট ও অস্পষ্ট শব্দসমূহ শিখিয়েছিলেন তাতে বিদ্যার্থীকে স্তম্ভিত করে' দেয় এবং ভাবকে প্রকাশের পরিবর্তে আচ্ছন্ন করে। আওরংজীবের মতে দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যাতে মনকে যুক্তিশীল ও আত্মাকে ধৃতিশীল করে, সম্পদেবিপদে স্থির মনোবৃত্তির গঠন করে এবং মানবচরিত্র ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুনিয়ন্ত্রিত গতির সংগে পরিচিত করে। উপরন্তু রাজপুত্রদের রাজার কর্তব্যসমূহ, যুদ্ধবিদ্যা, সৈন্যসজ্জা, অবরোধকৌশল প্রভৃতি কাযকর বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া উচিত।

উপরের উক্তি থেকে ইতিহাস, ভূগোল, বিশ্বপরিচয়, মাতৃভাষা ও অন্যান্য দেশের ভাষাসমন্বিত একটি পাঠ্যক্রম ও চরিত্রগঠনক্ষম পদ্ধতি ও রাজকীয় কাযিক শিক্ষার একটি পরিকল্পনা দেখতে পাওয়া যায়। তিনিও আকবরের মতো শিক্ষার দ্রুততত্ত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন। শিক্ষা বিষয়ে অভিমতে এইদিক দিয়ে আকবরের সংগে আওরংজীবের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু আকবরের শিক্ষানীতি যেখানে ছিল উদার ও ব্যাপক সেখানে আওরংজীবের শিক্ষানীতি সংকীর্ণ ও স্বার্থপর ছিল।

আওরংজীবের পর 'মোগলমহিমা রচিল শ্মশানশয্যা' কিন্তু তৎসত্ত্বেও শেষ কয়জন সম্রাট মাদ্রাসার সংস্কার ও প্রতিষ্ঠা ও দিল্লীর রাজকীয় গ্রন্থশালার প্রসারের কাজ বন্ধ করেননি। মহম্মদশাহের সময়ে (১৭১৯-১৭৪৮) জয়পুর, উজ্জয়িনী, মথুরা, বারাণসী ও দিল্লীতে (অসম্পূর্ণ যন্তর মন্তর-১৭২৪) মানমন্দির ছিল।

মুসলমানদের রাজত্বকালে অবরোধ প্রথার আধিক্যের ফলে স্ত্রীশিক্ষার সংকোচন ঘটেছিল বটে কিন্তু বালিকাদের শিক্ষার যে কোনো ব্যবস্থা ছিল না তা নয়। 'কানুন-ই-ইসলাম নামক গ্রন্থে মক্তবের বর্ণনায় বালক ও বালিকার উল্লেখ আছে, কিন্তু সে সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত মাত্র, তার পরই বালিকারা অবরোধে আবদ্ধ হ'ত।

অপরপক্ষে রাজকুলের নারীরা যে সুশিক্ষিতা হতেন তার কথা অন্যত্র বলা হয়েছে।

সুলতানা রিজিয়া সুশিক্ষিতা ছিলেন এবং সুলতান গিয়াসুদ্দীন অন্তঃপুরিকাদের জন্য শিক্ষয়িত্রীর নিয়োগ করতেন।

বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম 'হুমায়ুন নামা' রচনা করেছিলেন। হুমায়ুনের ভাগীনেয়ী সালিমা সুলতানা বিদুষী ছিলেন ও'মখ্‌লী' নাম নিয়ে কবিতা রচনা করতেন। আকবরের সময়ে ফতেপুরসিক্রির প্রাসাদের কয়েকটি কক্ষ নিয়ে বালিকা বিদ্যালয় বসতো। নূরজাহান আরবী ও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিতা ছিলেন এবং জাহাংগীর তাঁর সহায়তা ভিন্ন রাজ্যশাসন করতেন না। মমতাজ পারসী ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। শাজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারা বেগম বিদুষী ও বিদ্যোৎসাহিনী ছিলেন তাঁর নিজের কবরের জন্য রচিত কবিতাটি সুপ্রসিদ্ধ। জাহানারার শিক্ষয়িত্রী সতি-উন্নীসা পারসী ভাষা ভালো জানতেন ও মমতাজের নাজির ছিলেন। আওরংজীবের জ্যেষ্ঠা কন্যা জিবুন্নীসা বেগম আরবী ও পারসী ভাষায় পণ্ডিতা, লিপিকুশলা ও ও বিদ্যোৎসাহিনী ছিলেন; তৃতীয়া কন্যা বদ্রুন্নীসাও সুশিক্ষিতা ছিলেন। মুসলিম নারীরা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করিয়ে শিক্ষার আদর করতেন। আকবরের ধাত্রী মাহমাংগা, জাহানারার শিক্ষয়িত্রী সতি-উন্নীসা, বেগম বিবি রাজির নাম এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

উপসংহারে ভারতবর্ষের ইসলামীয় শিক্ষার বিষয়ে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলা যায়।

বাবর পাঠান যুগের বিষয়ে এবং বর্ণিয়র সাজাহানের সময়কার যে বিবরণ দিয়েছিলেন তা অতিরঞ্জিত হ'লেও তার থেকে অনুমান করা যায় যে ইসলামীয় শিক্ষা এ-দেশের মাটিতে দৃঢ়মূল হতে পারেনি। তার প্রথম কারণ হ'ল সম্ভ্রান্ত পৃষ্ঠপোষকগণের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা। দেশের বাদশা যদি বিদ্যোৎসাহী হতেন তবে দেশের শিক্ষার উন্নতি হ'ত নতুবা তার অধোগতি অনিবার্য ছিল। এই জন্য দেখি একবার হয়তো দেশের চারিদিকে শিক্ষার শতধারা প্রবাহিত আবার হয়তো পরবর্তি-কালেই তার স্রোতঃপথ রুদ্ধপ্রায়।

হিন্দুদের শিক্ষার যে সামাজিক ভিত্তি তাকে রাজা ও রাজ্যের পরিবর্তন সহ্য করে' আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা দিয়েছিল, বিদেশী ইসলামীয় শিক্ষাব্যবস্থার তা ছিল না। এই অবস্থার একটি মাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় আলাউদ্দীনের সময়ের দিল্লীর রাজার অত্যাচার উপেক্ষা করে' সাংস্কৃতিক গৌরব বজায় রাখায়।

দ্বিতীয়, মুসলমানদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান সাধারণত বৃহৎ হ'তনা। অনেক সময়ে মসজিদ্‌সংশ্লিষ্ট কোনো মোল্লার মুষ্টিমেয় ছাত্র নিয়ে এককেটি মাদ্রাসার সৃষ্টি হ'ত। এরূপ দুর্বল প্রতিষ্ঠান সহজে ধ্বংস হয়ে যেত।

এই অবস্থার ফলস্বরূপ দেখা যায় যে প্রত্যেক বিদ্যোৎসাহী বাদশাকে মক্তব ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠার কাজের সংগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের দিকে সমান দৃষ্টি দিতে হ'ত।

তথাপি দিল্লী, আগ্রা, বদাওন, ফিরোজাবাদ, আহ্‌মেদাবাদ, জৌনপুর প্রভৃতি ইসলামীয় শিক্ষার বহু কেন্দ্র ভারতের নানাস্থানে গড়ে' উঠেছিল, হিন্দু মুসলমানের মিলিত একটি সংস্কৃতি ধারারও প্রবর্তন

হয়েছিল। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব এর প্রকৃষ্ট দান। ভারতীয় জ্ঞান জগতে মুসলমানদের অপর দান ইতিহাস। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অর্ধেক কাহিনী ও অর্ধেক পুরাণ জাতীয় ছিল। মুসলমান ইতিবৃত্তকারেরা এদেশে প্রথম বাস্তবিক ইতিহাস লেখেন।

মধ্যযুগীয় হিন্দুমুসলমানের শিক্ষার বহু সাদৃশ্য দেখা যায়, যথা পঞ্চম বর্ষে হাতে খড়ি, ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা, মুখস্থ বিদ্যার আধিক্য ইত্যাদি। মুসলমানের মক্তব ও মাদ্রাসা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিন্দুদের টোল ও পাঠশালার মতো ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হ'ত। উভয় প্রকারের শিক্ষাতেই গুরুশিষ্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত ছিল এবং সর্দার পোড়োর সহায়তায় পড়ানোর পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মুসলমানদের শিল্পশিক্ষাও হিন্দুদের মতো শিক্ষানবীশী প্রথায় হ'ত।

প্রভেদের মধ্যে দেখি, মুসলমানের শিক্ষায় লেখার আগে পড়া আর হিন্দুদের শিক্ষায় পড়ার আগে লেখা ছিল এবং মুসলমানের শিক্ষার ধর্মের প্রভাব গভীরতর ছিল বলে' বিশুদ্ধ লৌকিক শিক্ষার প্রবর্তন তাদের মধ্যে হয়নি। মুসলমানের শিক্ষায় জাতিভেদের চিহ্নমাত্র ছিল না এবং তার প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুদের মধ্যেও জাতিভেদের মূল কিঞ্চিৎ শিথিল হয়েছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাদিতে প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখ না থাকলেও অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে অনুমান করা যায় যে এ-দেশে তার ব্যবস্থা অতি প্রাচীনকাল থেকে বেশ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সাধারণ্যের কথা নগণ্য মনে করার জন্য বোধ হয় সূত্রাদিতে তার উল্লেখ করা হয়নি।

মনুস্মৃতিতে বৈশ্যগণের শিক্ষার যে বিবরণ পাওয়া যায় তদনুসারে মাপ ও ওজন, বাণিজ্যে সম্ভাব্য লাভক্ষতি, বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভাষা, দ্রব্যাদি রক্ষা করার পদ্ধতি, ক্রয়বিক্রয়ের নিয়মাদি তাদের শিক্ষণীয় ছিল। এই শিক্ষা প্রধানত বংশানুক্রমে কর্মক্ষেত্রে আহৃত হ'লেও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার আগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন নিশ্চয় হ'ত। এর থেকে অনুমান করা যায় যে অন্তত বণিক সমাজের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীনতর ইতিহাসও তার সাক্ষ্য দেয়।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক লেখক নিয়র্কস্ ও কিউ কুর্টিসের বিবরণে জানা যায় যে ভারতীয়দের মধ্যে কাপড় বা বল্কলে চিঠি লেখার পদ্ধতি ছিল। অন্যপক্ষে মেগাস্থিনিস্ লিখে গেছেন যে ভারতীয়গণ নিরক্ষর ছিল এবং 'অলিখিত' নীতিসমূহের অনুসরণে তাদের বিচার হ'ত। এ-কথায় মনে হয় যে সাধারণ শিক্ষা হয়তো বৈশ্যদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহে জনশিক্ষার প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টের

পূর্বকালে রচিত (আঃ ৪৫০) 'শীল' নামক গ্রন্থে 'আক্ষরিকা' নামে এক খেলার উল্লেখ পাওয়া যায় যাতে শিশুরা পরস্পরের পিঠে আঙুল দিয়ে অক্ষর লিখে অনুমান করতো।

বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবগ্গে' রাজগৃহের উপালি নামক এক বালকের কথা আছে, যার পিতামাতা তার শিক্ষারম্ভের পূর্বে চিন্তা করছিলেন যে 'লেখা', 'গণনা' ও 'রূপ' এই তিনের মধ্যে কোন শিক্ষা তাকে দেবেন।

হস্তিগুম্ফা শিলালিপিতে (খৃষ্টপূর্ব ১৫৭।১৪৮) রাজা খারবেলের শৈশবশিক্ষার বর্ণনা আছে। 'ললিতবিস্তরে' শিশুদের লিপিশিক্ষার বিবরণ পাওয়া যায়। জাতকে 'ফলক', 'বর্ণক' প্রভৃতি লেখার উপকরণের নাম আছে। 'সিগালোবাদসুত্তে' সন্তানের শিক্ষাসম্বন্ধে মাতাপিতার কর্তব্য ও গুরুশিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের বিবরণ আছে।

রাজা অশোক (খৃষ্টপূর্ব ২৭২—২৩১) ধর্মোন্নতির উদ্দেশ্যে বহু শিলালিপি ক্ষোদিত করিয়েছিলেন। এই লিপিগুলি প্রত্যেক অঞ্চলে তত্তৎ আঞ্চলিক ভাষায় প্রচারিত হয়েছিল বলে' অনুমান করা যায় যে তখনকার জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাক্ষরতা ছিল।

সম্ভবত বৌদ্ধ-মঠগুলি থেকে জনশিক্ষার বহুল প্রচার হয়েছিল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলের শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষা দিত বলে' অনুমান করা যায়। বৃটিশ শাসনের প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধভিক্ষু-প্রচারিত যে ব্যাপক জনশিক্ষার ব্যবস্থা দেখা গিয়েছিল তার তুলনায় এই ধারণা আরো দৃঢ় হয় যে ভারতের বৌদ্ধযুগে নিশ্চয় অনুরূপ প্রথার প্রচলন ছিল।

বৌদ্ধযুগে জনসাধারণও যে শিক্ষার সমাদর ও উদ্যোগে তৎপর ছিল জাতকে তারও প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। লোসক জাতকে বর্ণিত আছে

যে বারাণসীর অধিবাসীরা এক শিক্ষকের নিয়োগ করে তাঁর আবাসের ও বেতনের ব্যবস্থা করলো এবং তারা দরিদ্র বিদ্যার্থিদের শিক্ষা ও ব্যয়-ভার বহন করতো। তিত্তির জাতকে আছে যে বারাণসীর এক অধ্যাপক হিমালয়ে প্রস্থান করলেন এবং সেই অঞ্চলের লোকে গুণী ব্যক্তির আগমনে আনন্দিত হয়ে' স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তাঁর সকল প্রকার আর্থিক অভাবসমূহের ভার গ্রহণ করলো।

মৌর্যযুগে ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির ফলে বৈষয়িক শিক্ষা, তথা সাধারণ্যের শিক্ষার নিশ্চয় অনেক উন্নতি হয়েছিল।

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রাচীনত্বের এইরূপ বহু প্রমাণ পাওয়া গেলেও এ প্রাচীন গ্রাম্যব্যবস্থার অংগীভূত ছিল কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। আলটেকর মনে করেন যে গ্রামের সাধারণ কর্মিদের মধ্যে 'গুরু' একজন ছিলেন এবং তাঁকে হয় নিষ্কর ভূমি দান করা হতো নয়তো গ্রামের উৎপন্ন শস্যের একাংশ তাঁর জন্য নির্ধারিত করা থাকতো। গ্রামের পুরোহিত সাধারণত গুরুর পদ নিতেন এবং দেবসেবার পর শিশুদের শিক্ষা দিতেন। অপরপক্ষে অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে এইরূপ ভূমি বা শস্যদানের যথেষ্ট প্রাচীন ও ব্যাপক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

উভয় পক্ষের বাদানুবাদ অতিক্রম করে' বলা চলে যে প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ্যব্যবস্থায় হয়তো ব্যাপক লোকশিক্ষার রীতি ছিল না, পরে, জনপদ সভ্যতা ও ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির ফলে, সামাজিক প্রচেষ্টায় এর প্রচলন হয় এবং বহু ক্ষেত্রে এ গ্রাম্যব্যবস্থার অংগীভূত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ-প্রভাবের সময়ে যখন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা সাধারণ শিক্ষার বহুল প্রচারের সহায়তা করেন তখন থেকে হয়তো গ্রাম্য পুরোহিতের সংগে তার যোগ শিথিল হয়েছিল এবং অব্রাহ্মণ-শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এইরূপে, নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে, মুসলমানের রাজত্বকাল পর্যন্ত উপনীত হয়ে দেখা যায় যে পাঠশালা, টোল ও চতুষ্পাঠী তখনকার হিন্দুদের শিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল।

টোল ও চতুষ্পাঠী মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। চতুষ্পাঠী শাস্ত্রপাঠের কেন্দ্র ছিল এবং অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধপ্রাধান্যের যুগে বৌদ্ধমঠসংশ্লিষ্ট 'ব্রহ্মচারী'দের শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে টোলগুলি প্রথমে স্থাপিত হয় এবং সেগুলি পরে ব্রাহ্মণ্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। টোলে সাধারণত কেবল ব্রাহ্মণসন্তানদেরই পড়ানো হ'ত। তারা আনুমানিক দশ বৎসর বয়সে আরম্ভ করে' আট থেকে বার বৎসর ধরে এখানে পড়তো। শিক্ষণীয় বিষয়ের অনুসারে শিক্ষাকাল নির্ধারিত হ'ত। একেক প্রতিষ্ঠানে জনা পঁচিশেক শিষ্য থাকতো। শিষ্যদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সরল ছিল এবং তাদের বাসের কুটির ও গ্রাসাচ্ছাদনের সমুদয় ভার গুরু গ্রহণ করতেন। নির্দিষ্ট কোন বেতনের ব্যবস্থা ছিল না এবং দরিদ্রদেশে যথেষ্ট দক্ষিণার আশাও ছিল না বলে' সাধারণের উদারতার উপরই গুরু-শিষ্যের ভরসা ছিল।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিষ্যরা গুরুগৃহে বাস করার পরিবর্তে নিজেদের আহার ও বাসের ব্যবস্থা করতো এবং গুরু প্রভাতে এসে সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত থেকে অধ্যাপনা করে' যেতেন। বারাণসীর মতো তীর্থস্থানে পুণ্যকামীরা বিদ্যার্থিগণের জন্য আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন।

এই ব্যবস্থার একটা বিশেষত্ব ছিল বড় ছেলেদের দ্বারা ছোটদের তত্ত্বাবধান। গুরু তাঁর অধ্যাপনায় বড় ছাত্রদের সহায়তা নিতেন এবং শিষ্যেরা যখন গুরুগৃহ ভিন্ন অন্যত্র বাস করতো তখন বড় শিষ্যরাই ছোটদের অভিভাবকস্বরূপ থাকতো।

পাঠশালাগুলি গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। এখানে শিশুরা লেখাপড়া অংক ও কিছু পৌরাণিক কাহিনী শিখতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য ব্যাকরণ, অভিধান ও কাব্য পড়ানো হ'ত। ধর্ম ও নীতিশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

পাঠশালাগুলিতে চণ্ডাল ও অস্পৃশ্যদের শিক্ষা দেওয়া না হ'লেও ব্রাহ্মণেতর উচ্চবর্ণের বালকদের নেওয়া হ'ত বলে' এর ভিত্তি টোল ও ও চতুষ্পাঠী আপক্ষা প্রশস্ত ও গণতান্ত্রিক ছিল।

মুসলমান আক্রমণ ও অধিকারের ফলে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার হানি ঘটে। ভারতের প্রথম মুসলমান নবাব মহম্মদ ঘোরী উত্তর ভারতের বহু মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ ও তৎসংশ্লিষ্ট মক্তব ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে যথাক্রমে মক্তব ও মাদ্রাসার প্রচলন হয়। পরবর্তী মুসলমান রাজগণের অনেকেই এই ভাবে হিন্দুর মন্দিরের ভগ্নস্তূপের ওপর মুসলমান ধর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা হিন্দুদের শিক্ষার জন্য প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি ও অন্যান্য রাজকীয় সাহায্যের প্রত্যাহার করেছিলেন। এই ভাবে হিন্দুর শিক্ষাব্যবস্থা রাজকীয় ও ধর্মীয় সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে একান্তভাবে সমাজের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

মুসলমানপ্রবর্তিত মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থার বিবরণ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। মুসলমান ছেলের চার বৎসর, চার মাস, চার দিন বয়স হ'লে তার 'মক্তব' অনুষ্ঠান হ'ত। হিন্দুদের 'হাতে-খড়ি'র মতো এ তার শিক্ষার প্রথম অনুষ্ঠান ছিল। এই সময়ে তাকে সুসজ্জিত করে' বিদ্যালয়গৃহে 'আখনজি'র সম্মুখে স্থাপিত করে' তার হাতে কোরাণের 'সূরহি ইক্রা' নামক এক নির্দিষ্ট অংশ ক্ষোদিত রূপার ফলক দেওয়া হ'ত এবং শিক্ষক তাকে এই অংশটি

কণ্ঠস্থ করাতেন। এরপর কোরাণের 'কলিমা' অংশ কণ্ঠস্থ করা হ'লে পর, আনুমানিক সাত বৎসর বয়সে বালকের কোরাণ ও ধর্মের আচার ও উপদেশের শিক্ষা আরম্ভ হ'ত। এই ছিল মক্তবের শিক্ষার নিম্নতম মান, তবে অধিকাংশ মক্তবে এর সংগে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হ'ত। পড়া, লেখা, সামান্য অংক, কিছু দরবেশ ও পীরপয়গম্বরদের কাহিনী ও কিছু পারসী কাব্য নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হ'ত। শিক্ষার মাধ্যম পারসী ভাষা ছিল।

মাদ্রাসার শিক্ষার বিবরণ মিঃ উইলিয়াম এডাম উনবিংশ শতাব্দীতে যা লিপিবদ্ধ করে' গেছেন তার থেকে জানা যায় যে এখানে উচ্চমানের ব্যাকরণ, অলংকার, আইন, তর্কশাস্ত্র, ইসলামের তত্ত্ব ও আচার, টলেমির নক্ষত্রবিদ্যা, জড়বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়ানো হ'ত। শিক্ষার মাধ্যম আরবী ও পারসী ছিল।

মাদ্রাসার ওই পাঠ্যক্রমের সংগে য়ুরোপের মধ্যযুগীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার সাদৃশ্য দেখা যায়। য়ুরোপীয় 'ডায়ালেক্‌টিকের' মতো এখানে 'তর্কবিদ্যা' পড়ানো হ'ত ও 'উচ্চবিদ্যার' পরিবর্তে আইন ও ধর্মনীতি পড়তো। মাদ্রাসার পুরাতন বিবরণে য়ুরোপীয় 'কলেজের' মতো চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ানোর ব্যবস্থা থাকলেও পরবর্তিকালে 'হাকিমী' শিক্ষা পৃথক হয়েছিল। অপরপক্ষে য়ুরোপের প্রতিষ্ঠানে যেমন সংগীতচর্চা হ'ত এখানে তার অনুরূপ কিছু দেখা যায় না। ইস্‌লামীয় শিক্ষাসংস্কৃতি একদিন সমস্ত য়ুরোপকে প্রভাবিত করে' তার রেনাসাঁর বীজ বপন করেছিল, কিন্তু ভারতে আসার পূর্বে তার গৌরবময় দিনগুলি অতীত হয়ে যাওয়ার ফলে এ-দেশে সে অনুরূপ কোনো আলোড়ন আনতে পারেনি, মধ্যযুগীয় গতানুগতিকতার অনুবর্তন করে' চলেছিল মাত্র।

মুসলমানী আমলে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে পারসী ভাষার প্রচলন হওয়াতে

ক্রমশ অনেক হিন্দু মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করে। এদের চাহিদা মেটাবার জন্য ক্রমশ ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণ শিক্ষার জন্যও কিছু কিছু পারসী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আকবরের সময়ে বাংলাদেশের অংকশাস্ত্রে 'শুভংকরীর' প্রবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

হিন্দুদের চতুষ্পাঠী, টোল ও পাঠশালাগুলিও পরিবর্তিত অবস্থায় কোনরূপে আত্মরক্ষা করে' রয়েছিল। এই সময়কার পাঠশালাগুলিকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমত গ্রামের বা গ্রাম্য জমিদারের গৃহদেবতার মন্দিরের পূজারি ব্রাহ্মণ গ্রামের শিশুদের শিক্ষা দিতেন। তিনি শিষ্যদের কাছে সামান্য বেতন ও দক্ষিণা পেতেন ও কিছু দেবোত্তর বা ব্রহ্মোত্তর ভূমিও থাকতো।

দ্বিতীয়ত, অনেক সময়ে জমিদার বা অপর কোনও ধনী ব্যক্তি নিজ সন্তানের শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করে' কাছারিবাড়ি বা চণ্ডীমণ্ডপের অংশে পাঠশালা বসাতেন। হয়তো তিনি সমগ্র ব্যয়ভার নিজে বহন করতেন, নয়তো অধিকাংশ তিনি দিতেন ও অন্যান্য ছাত্রদের কাছে কিছু আদায় হ'ত।

তৃতীয়ত, কোনো বর্ধিষ্ণু গ্রামে শিক্ষার চাহিদা দেখলে হয়তো কোনো পণ্ডিত অর্থোপার্জনের আশায় পাঠশালা খুলতেন।

চতুর্থত, অনেক সময়ে গ্রামের ব্যবসায়ী মহাজনেরা সংঘবদ্ধভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। দক্ষিণভারতে এরূপ মহাজনী পাঠশালার অস্তিত্ব বহুদিন পর্যন্ত ছিল।

এই বিদ্যালয়গুলিকে প্রাচীন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বলে' এবং গুরু-গণকে প্রাচীন গ্রাম্য-সমাজের ধোপা-নাপিত, ছুতোর-কুমোর-কামার

প্রভৃতির মতো অংগীভূত বলে মনে করা যায় না। ঐতিহাসিক প্রমাণে প্রাচীন ব্যবস্থার অস্তিত্ব সিদ্ধ হ'লেও মুসলমান-শাসনের মধ্যে সেই ব্যবস্থার সংগে যোগসূত্র নিশ্চয় খণ্ডিত হয়েছিল।

বৃটিশেরা এদেশে রাজ্যস্থাপন করার পর উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে এতদ্দেশীয় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তার মধ্যে মিঃ উইলিয়ম এডামের বাংলাদেশের তদন্তের বিবরণই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তিনটি রিপোর্ট লিখেছিলেন। হিন্দুদের শিক্ষালয়ের মধ্যে পাঠশালা এবং টোলের এবং মুসলমানদের শিক্ষালয়ের মধ্যে মক্তব ও মাদ্রাসার উল্লেখ তিনি করেছেন।

তাঁর মতে বাংলাদেশের প্রত্যেক নগরে ও বৃহত্তর গ্রামে পাঠশালা ছিল। সাধারণত একেকটি পাঠশালায় বারো থেকে কুড়িজন পর্যন্ত 'পোড়ো' থাকতো। তারা সাধারণত প্রাতঃকালে কোনো গাছের তলায়, কারো দাওয়ায়, আটচালায় বা অন্য কোনো আশ্রয়ে এসে বসতো। বেলা নটা-দশটা পর্যন্ত পড়া হ'ত আবার বেলা তিনটে থেকে আরম্ভ করে' সন্ধ্যা পর্যন্ত। গুরুমহাশয় 'সর্দার পোড়ো'দের সাহায্যে পড়াতেন এবং প্রত্যেক পোড়োকে ব্যক্তিগতভাবে দেখাশোনা করতেন। পাঠশালার শ্রেণিবিভাগ থাকতো না, বিভিন্ন মানের বালক একসংগে পড়তো বলে' ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান ছাড়া পড়ানো সম্ভব হ'ত না। পাঠশালার শৃংখলারক্ষার ব্যাপারেও গুরুমহাশয় সর্দার-পোড়োর সাহায্য নিতেন।

গুরুমহাশয়রা প্রধানত কায়স্থ ছিলেন; বৈদ্য ও ক্ষত্রিয়গণ এইরূপ সামান্য শিক্ষকতার কাজকে অগৌরবকর বলে' মনে করতো। মিঃ এডাম বর্ধমানে দুইজন কুষ্ঠরোগীকে শিক্ষকতা করতে দেখেছিলেন।

পাঠশালার কোনো নির্ধারিত বেতন ছিলনা, গুরুমহাশয়রা যে দক্ষিণা পেতেন তাতে তাঁদের গড়ে মাসিক চার পাঁচ টাকা আয় হ'ত। শিক্ষকতা ভিন্ন চাষবাস বা অন্য কোনো ব্যবসাও তাঁদের করতে হ'ত।

পোড়োদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থের সংখ্যা বেশি থাকলেও সকল জাতের, এমন কি মাঝে মাঝে অস্পৃশ্যদের পর্যন্ত, ছেলে দেখা যেত। গড়ে ছয় থেকে ষোলো বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক ছেলেরা এখানে পড়তো। শিক্ষা একান্তভাবে বৈষয়িক ও কার্যকরী ছিল। নীতিশিক্ষার দিক সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হ'ত।

মক্তবের শিক্ষকেরা মুসলমান হ'তেন। তাঁদের "আখনজি" বলা হ'ত। এডামের মতে সাধারণত এঁদের মান গুরুমহাশয়দের অপেক্ষা উন্নত ছিল। এঁদের সামাজিক ভিত্তি কম ছিল বলে' ধনী পৃষ্ঠপোষকগণের ওপর নির্ভরতা অধিক ছিল। এঁদের মাসিক আয় গড়ে পাঁচ-সাত টাকা হ'ত,।

মক্তবে আগে পড়া ও পরে লেখা এবং পাঠশালায় আগে লেখা ও পরে পড়া শেখানো হত। উভয় শ্রেণীর বিদ্যালয়েই সুন্দর হস্তলিপির ওপর জোর দেওয়া হ'ত, কিন্তু মক্তব ও মাদ্রাসায় হস্তলিপি কারুশিল্পের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।

মক্তব ভিন্ন মুসলমানদের আরো কতকগুলি বিদ্যালয় ছিল যেখানে হিন্দুরাও পড়তো এবং বাংলা ও পারসী এই দুই ভাষা পড়ানো হ'ত।

হিন্দুমুসলমানের এই বিদ্যালয়গুলি ছাড়া গৃহশিক্ষার রীতিও প্রচলিত ছিল। এডাম বলেছেন যে অনেক পরিবারে সন্তানের পাঁচ বৎসর বয়স হ'লে পিতাই তার অক্ষরপরিচয় করিয়ে দিতেন। এইভাবে অনেক সময়ে পরিবারের কয়েকটি ছেলেপিলে নিয়ে গার্হস্থ্য পাঠশালার মতো গড়ে' উঠতো। তাছাড়া কখন কখন জমিদার বা ধনী ব্যক্তিরা নিজ

পরিবারের সন্তানদের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে’ পারিবারিক শিক্ষা-কেন্দ্রের সৃষ্টি করতেন, এগুলিতে অনেক সময়ে পরিবারের বাহিরের ছেলেদেরও বেতন দিয়ে অথবা বিনা বেতনে পড়তে দেওয়া হ’ত।

১৮২২-২৬ খৃষ্টাব্দে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে, এক তদন্তে অনুমিত হ’য়েছিল যে উক্ত প্রদেশের বিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত বয়সের ছেলেদের মধ্যে ষষ্ঠাংশ কোনো না কোনো প্রকার শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছিল। ১৮২৩-২৮ খৃষ্টাব্দের এক তদন্তে জানা যায় যে বোম্বাইয়ে অনুরূপ বয়সের ছেলেদের অষ্টমাংশ শিক্ষা পাচ্ছিল। মিঃ এডাম বাংলাদেশের এক জিলায় পুরুষদের মধ্যে শতকরা ১৩·২ জনের স্বাক্ষরতার প্রমাণ পেয়েছিলেন এবং অন্য এক জিলায় দেখেছিলেন যে বিদ্যালয়ে যাবার উপযোগী ছেলেদের মধ্যে শতকরা নয়জন শিক্ষা পাচ্ছে। উইলিয়ম ওয়ার্ড অনুমান করেছিলেন যে বাংলাদেশের পুরুষদের মধ্যে পঞ্চমাংশ সাক্ষর ছিল, কিন্তু মেয়েরা প্রায় সকলেই নিরক্ষর ছিল। ক্বচিৎ কোনো ধনিগৃহ ব্যতীত মেয়েরা শিক্ষার কোনো সুযোগ পেত না।

জনশিক্ষার ব্যবস্থা দেশের প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান থাকলেও তার মানের কোনো স্থিরতা ছিল না আর আধুনিক আদর্শানুযায়ী ওই মান যে অত্যন্ত নীচু ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পাঠশালার শিক্ষার আদর্শ নিতান্ত সংকীর্ণভাবে কার্যিক ছিল এবং মক্তবের কোরাণশিক্ষাও ছিল না-বুঝে মুখস্থ করা নিরর্থক আচারের পর্যায়ে। চরিত্রগঠনের কোনো চেষ্টা ছিল না। ছাত্রের ব্যক্তিত্বের দিকে দৃকপাত না করে’ কতকগুলি বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হ’ত। সূত্র ও ধারা কণ্ঠস্থ করাই শিক্ষার প্রধান অংগ ছিল। মক্তব বা পাঠশালায় যখন সাহিত্য পড়ানো হ’ত তখনও তাতে সাহিত্যিক আলোচনার স্থান থাকতো না। শাসন ও শৃংখলার ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক ছিল। গুরুমহাশয়রা ধনিদের

ওপর নির্ভরশীল ছিলেন বলে' তাদের ছেলেদের অত্যন্ত খোসামোদ করতেন। অপরপক্ষে শাস্তির প্রকৃতি ছিল কঠিন ও পাশব।

এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে ভালো কিছুই ছিল না তা নয়। অনেকে পাঠশালার লেখন পদ্ধতির সংগে মন্তেসরি পদ্ধতির তুলনা করে' থাকেন। তার কারণ পড়ার আগে লেখা শেখানো এবং দাগা বুলিয়ে হাতের লেখার অভ্যাস। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এ তুলনায় মিলের চেয়ে প্রভেদ বেশি ধরা পড়ে।

শিক্ষার পদ্ধতি ব্যক্তিগত ছিল বলে' প্রত্যেক ছেলে নিজের বুদ্ধি-অনুসারে চলতে পারতো, ফেলকরা ছাত্রের মর্মদাহের উৎপত্তি হ'ত না, এক বৎসর সময়ও নষ্ট হ'ত না।

পাঠশালার 'সর্দারপোড়ো' ব্যবস্থায় এক-শিক্ষকচালিত গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-সমস্যা সমাধানের একটি উপায় পাওয়া গেছিল। মিঃ বেল ও ল্যাংকাষ্টার এই পদ্ধতিরই অনুকরণ করেছিলেন।

উপকরণের দিক দিয়ে এই শিক্ষা অতি সুলভ ছিল এবং শিক্ষকের জীবন গ্রাম্য-জীবনের অন্য পেশার সংগেও জড়িত থাকাতে শিক্ষকতার দারিদ্র্য বর্তমানের মতো সুদুর্ভর হ'ত না। এইসব কারণে দরিদ্র গ্রাম্য-সমাজের পক্ষে এই শিক্ষার ভারবহন সম্ভবপর ছিল।

এই লৌকিক ও কার্যিক শিক্ষা সংকীর্ণ হ'লেও গ্রাম্য-জীবনের অভাব পূরণ করতো। উপরন্তু পাঠশালাগুলি গ্রামের একান্ত নিজস্ব ছিল বলে' এখানে লেখাপড়া শিখে ছেলে বিগড়ে যেত না অথবা গ্রাম্য-জীবনের অনুপযোগী হয়ে উঠতো না।

পাঠ্যক্রম ছিল পড়া, লিপি, চিঠিলেখা, প্রাথমিক গণিত ও হিসাব। কৃষি বা বাণিজ্য সম্পর্কিত বা উভয় প্রকারেরই হিসাব শেখানো হ'ত। পাঠ্যপুস্তক কম ছিল, এবং যেগুলি ছিল, সেগুলিও অনুপযুক্ত।

যথা রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক কাব্য ইত্যাদি। শিক্ষার চারিটি ধাপ ছিল।

প্রথম ধাপে পোড়োকে কাঠি দিয়ে মাটিতে অক্ষর লিখতে হ'ত। এই কাজ দশদিনে শেষ হ'ত।

দ্বিতীয় ধাপে গুরুমশাই লোহার খুন্তি দিয়ে তালপাতায় অক্ষর লিখে দিতেন ও পোড়োরা খাগের কলমে ভূষো দিয়ে তার ওপর দাগা বুলোতো। এই লেখা চটপট মুছে ফেলা যেত বলে' একই পাতায় বারবার অভ্যাস চলতো। এইভাবে ক্রমে গুরুমশায়ের সাহায্য ছাড়া লেখার ক্ষমতা জন্মালে পোড়ো অন্য একটি পাতায় লিখতো। তারপর সে যুক্তাক্ষর লিখতে ও উচ্চারণ করতে অভ্যাস করতো, তারপর বর্ণযোজনা দ্বারা সাধারণ বিশেষ্য ও নামশব্দ লিখতে শিখতো।

তৃতীয় ধাপে কলাপাতার ব্যবহার হ'ত। এই স্তরে শব্দযোজনা, বাক্যরচনা, কথিত ও লিখিত ভাষায় প্রভেদ এবং যোগবিয়োগাদি গাণিতিক নিয়মসমূহ শিক্ষণীয় ছিল। কুড়ির ঘর পর্যন্ত নামতা শেখার পর পুনঃপুনঃ যোগ ও বিয়োগের নিয়মস্বরূপ গুণ ও ভাগ শেখানো হ'ত। প্রত্যহ সকালে একবার সব পোড়ো সমস্বরে নামতা পড়তো। সর্বশেষে কৃষি ও বাণিজ্যিক হিসাব শেখানো হ'ত।

চতুর্থ ধাপে উচ্চতর মানের হিসাব ও ব্যবসাবাণিজ্যসম্বন্ধীয় চিঠি, আবেদনপত্র, দানপত্র প্রভৃতি লেখা শেখানো হ'ত। এই স্তরে কাগজের ব্যবহার হ'ত। একবৎসর কাল এইরূপ শিক্ষার পর পোড়োদের অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে রামায়ণ, মহাভারত, মনসামংগল প্রভৃতি পড়ার যোগ্যতা হ'ত।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বোম্বাই প্রদেশে পণ্ডিতকে 'পণ্টোজি' বলা হ'ত। তিনি সকাল ছটায় বেরিয়ে

পথে পথে ছাত্র সংগ্রহ করতে করতে বিদ্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'তেন। মাদ্রাজ প্রদেশে 'প্যাল' বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হ'ত। প্রথমে বালি-ছড়ানো মেঝেয় আঙুল দিয়ে লিখে, তারপর 'শ্লেট ও 'কজন' পাতায় হাতের লেখা শেখানো হ'ত। হিসাব ও দলিলপত্রাদি লেখা বাংলাদেশের মতই শেখানো হ'ত। কাগজের অপচয় না করে' লেখাপড়া শেখা হ'ত। লেখার আগে পড়া-শেখার নিয়ম ছিল। সমস্বরে মুখস্থ করার ব্যাপার ভিন্ন শিক্ষা ব্যক্তিগত ছিল। সর্দার-পোড়োর রীতি প্রচলিত ছিল।

এই সময়কার হিন্দু ও মুসলমানের শিক্ষার তুলনা করলে দেখা যায় যে পাঠশালা ও টোলের মধ্যে কোনো সংযোগ ছিল না, কিন্তু মক্তব ও মাদ্রাসাগুলি পারস্পরিক সম্বন্ধে যুক্ত ছিল। পাঠশালার শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা এবং শিক্ষার প্রকৃতি লৌকিক ছিল। মক্তব-গুলিতে উর্দুভাষা শিক্ষার মাধ্যম ছিল না, রাজকীয় ভাষা বলে' পারসী ও ধর্মীয় ভাষা বলে' আরবীর আধিপত্য ছিল। পাঠশালার শিক্ষা বিশুদ্ধভাবে কার্যকরী ও মক্তবের শিক্ষা সাহিত্যিক ছিল। পাঠশালার শিক্ষা লৌকিক ও মক্তবের শিক্ষা ধর্মপ্রভাবিত ছিল। যে-সব মক্তবে কেবলমাত্র কোরানের নিত্যব্যবহার্য অংশসমূহ মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হ'ত তার শিক্ষক অনেক সময়ে নিরক্ষর হ'তেন।